সেবকের নিবেদন।

অর্থাৎ

শ্রীনববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের

উপদেশ।

[তৃতীয় খণ্ড।]

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৭। জ্যৈষ্ঠ।

সেবকের নিবেদন।

অর্থাৎ

শ্রীনববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের

উপদেশ।

[তৃতীয় খণ্ড।]

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৭। জ্যৈষ্ঠ।

৭২ নং অপার সারকিউলার রোড।
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ব্রাহ্ম সমাজ ও নববিধান	১
ঈশা এবং চৈতন্যের গূঢ়যোগ	৭
পৃথিবীর মহাজনগণ	১৩
ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণে প্রমাণ	১৮
যেখানে ঈশ্বব সেখানে ভক্ত	২৪
ঈশ্বর প্রেরিত	২৭
ব্রহ্মতেজ	৩২
ব্রহ্ম দর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক	৩৫
দর্শন ও নিরীক্ষণ	৪০
ভাগবতী তনু	৪২
ত্রিনীতিবাদ	৪৯
পাপীব জন্য সাধুর প্রায়শ্চিত্ত	৫৫
বিষয় এবং বৈবাগ্য	৬১
ভবিষ্যতের সন্তান	৬৭
দেহ তত্ত্ব	৭৩
ব্রহ্ম প্রেম চির-সরস	৭৯
পাপাসুর জয়	৮২
কপটতার ঔষধ কপটতা	৮৯
শব্দব্রহ্ম	৯৭
মন্ত্র এবং ব্রত	১০৪
দুই পক্ষী	১১৫
তিন যুদ্ধ	১২১
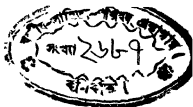
সেবকের নিবেদন।

ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৯ পৌষ, ১৮০২ শক।

দুই জন ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু যথাসময়ে বঙ্গদেশের অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমের পথ প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই দুই জনের নাম অনেকেই জানেন, বলা বাহুল্য। এক জন এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর এক জন অনেক বৎসর এই ব্রাহ্মসমাজ পরিপোষণ করিয়াছেন। এক জন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের ভ্রম, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অন্ধকার অনেক পরিমাণে দূর করিলেন, আর এক জন ব্রহ্মপ্রেম প্রচার করিয়া ব্রহ্মোপাসনাকে পরিপুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন। এক জন জ্ঞানাস্ত্রে ভারতবর্ষের অনেক শতাব্দি সঞ্চিত ভ্রমজাল এবং জঙ্গল কাটিলেন, আর এক জন ব্রহ্মপ্রেম প্রকাশ করিয়া নানাস্থানের লোককে একত্র করিয়া সেই পরিষ্কৃত ভারতভূমিতে একটি উপাসকমণ্ডলীরূপ উদ্যান প্রস্তুত করিলেন। ইহাঁরা উভয়েই ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের বেদ-বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাতে জীবনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই দুই জন সাধু মহাত্মা ধন্য। ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মসমাজ চিরদিন অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞভাব সহিত নমস্কার করিবে। এই দুই জনের সাহায্যে হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া যত দূর উন্নত হইতে পারে উন্নত হইয়াছে। এই দুই জন আপন আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুরাগ বলে হিন্দুসমাজকে অনেক দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া অবশেষে এত দূর

উচ্চ স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিন্দুসমাজ আর কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না। তাঁহাদিগের দ্বারা সংস্কৃত সেই হিন্দু সমাজ তখন বিস্তীর্ণ পৃথিবীর দৃষ্টিপথে পড়িল। পৃথিবীর দশ দিক হইতে নানাজাতি আসিয়া তখন সেই সংস্কৃত সমাজকে বলিল,— 'স্বার্থপর হিন্দুসমাজ, ঈশ্বরের সত্য কত কাল আর তুমি কেবল আপনার জাতির মধ্যে বদ্ধ রাখিবে? আমরা কি ঈশ্বরের কেহ নহি, আমরা কি তোমার সত্যরাশির অংশগ্রহণে অধিকারী নহি? হে হিন্দু, কি কারণে তুমি অপরাপর জাতিকে তোমার স্বর্গীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবে?" এ সকল কথা শুনিবামাত্র সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজের স্বার্থপরতা বন্ধন খসিয়া পড়িল। হিন্দুসমাজ আপনার ভ্রান্তি ও সংকীর্ণতা বুঝিতে পারিলেন। কেবল স্বীয় জাতির প্রতি পক্ষপাতী হইয়া জগতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা যে অনুচিত ব্রাহ্মসমাজ তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন ঝনাৎ করিয়া হিন্দুস্থানের দ্বার উন্মুক্ত হইল। চিন দেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত দেশ ও যত জাতি আছে সমুদয় হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল। সমুদয় জাতি আসিয়া হিন্দুস্থানের ধর্ম্মকে আপন আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, সড়াং করিয়া এখন সেই নিশান ভূতলে পড়িয়া গেল, হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম এত দিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। যেখানে কেবল বেদ বেদান্তের আদর ছিল, সেখানে বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তার প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র আসিল। নববিধানানুসারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র, তেমনি বাইবেল, কোরাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্রও পবিত্র। নববিধানের ডালে বসিয়া হিন্দু পাখীদের সঙ্গে খৃষ্টান পাখী, মুসলমান পাখী, বৌদ্ধ পাখী সকলে একত্র হইয়া সুরে সুরে মিশাইয়া ব্রহ্মনাম গান করিতে লাগিল। নববিধানে জাতিভেদ, স্থানের ব্যবধান, কালের ব্যবধান রহিল না। নববিধানে সকল জাতি এক মনুষ্যজাতিতে পরিণত হইল। নববিধানে গঙ্গাজলের সহিত টেমসনদীর জল সম্মিলিত

হইল। নববিধানের আমেরিকাস্থিত প্রকাণ্ড এন্‌ডিসগিরিশিখরোপরি হিমালয় চড়িল। নববিধানে বঙ্গীয় সাগরের সঙ্গে পেসেফিক্ সমুদ্র এবং আটলান্টিক সমুদ্র এক হইয়া গেল। নববিধানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এক দিকে একটি সূর্য্য ছিল, নববিধানের আগমনে দশ দিকে কোটি সূর্য্য প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মা বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজকে এত দূর উন্নত করিয়াছেন যে সেই উন্নতির অবস্থায় নববিধান অনিবার্য্য। ব্রাহ্ম সমাজ এই দুই জনের দ্বারা এত দূর উচ্চ অবস্থায় আনীত, যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যোগ হইবেই হইবে। পৃথিবীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজ প্রশস্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী হইল। নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি সমুদয় ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি আপনার অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিম অবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, নববিধান সমুদয় হইতে সার ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও নববিধানের নিকট আপনার সমস্ত উৎকৃষ্টতম সামগ্রী সকল আনিয়া উপস্থিত করিল। পৃথিবী নববিধানকে বলিলেন, "হে নববিধান, আমাকে ঈশ্বর যত প্রকার সত্যরত্ন, সৌন্দর্য্য, এবং মহত্ত্ব দিয়াছেন, সে সমস্ত তোমার হইল। বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার। তুমি কিছুই পরিত্যাগ করিতে পার না। বেদ বেদান্তের পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাও তোমার। তুমি কেবল এক দেশের কিংবা এক যুগের সচ্চরিত্র সাধুদিগকে ভক্তি করিয়া ক্ষান্ত হইতে পার না, তুমি আদরের সহিত পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে বরণ কর।" প্রকাণ্ড নববিধানের প্রাদুর্ভাবে হিন্দুস্থানের চারিদিগের সীমা ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দুর সঙ্কীর্ণ ঠাকুরঘর বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইল। হিন্দুর ভাগিরথীর দুই পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া গেল। সকলই জলময়, নববিধানের অকুল সাগরে সমুদায় ডুবিল। নববিধান ইহকাল পরকাল এবং সমস্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য আলিঙ্গন করিয়াছেন। পূর্ব্বকার বেদ বেদান্তের সীমা ছিল, এখনকার বেদের সীমা নাই। এখনকার বেদ সত্য। নববিধান মতে সত্যই বেদ, সুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পূর্ব্বে দশ অবতার ছিল, এখন অপরাপর ধর্ম্মের

সমুদয় অবতারও ঐ দলে সন্নিবিষ্ট হইল। নববিধানের সকলই অসীম, ইহাতে কিছুই সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিংবা কোন বিশেষ কালে বদ্ধ নহে। যখন বেদ বাইবেল ছিল না, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না, যখন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে তখনও ইহা থাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান। যাহা সমুদয় বিধানকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে না, তাহা নববিধান নহে। নববিধান প্রকাণ্ড, ইহার বাহু অত্যন্ত দীর্ঘ ইহার তনু বীরের ন্যায় বৃহৎ। কিরূপে ইহা সংকীর্ণ বস্ত্রে বদ্ধ থাকিবে? যেমন ইনি বাহু প্রসারণ করিলেন তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র গাত্রাবরণ ছিঁড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড হস্তী একবার আস্ফালন করিল, আর চারি দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাঁহার বাসগৃহ সমস্ত পৃথিবী তিনি কিরূপে হিন্দুর একটি ছোট ঘরে অবরুদ্ধ থাকিবেন? প্রকাণ্ড আকাশ কি আর্য্য মুষ্টিতে বদ্ধ থাকিবে? নববিধান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। নববিধানের মস্তক স্বর্গে, হস্ত দ্যুলোকে, চরণ পাতালে। প্রকাণ্ড বিধান দেশ কালে অপরিচ্ছিন্ন। যে দিন হইতে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি সেই দিন হইতে প্রশস্ততর পথে অগ্রসর হইতেছি। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম ছিল, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধর্ম্ম হইল। নববিধান কেবল হিন্দুদিগের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সমুদয় জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই নববিধান ঈশ্বরকে প্রেমদান করিয়া ঈশ্বরের সমুদয় সন্তানকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন। নববিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সমুদয় পুরাতন বিধানের ভিন্নতা ও যোগ উভয়ই বুঝায়। ইহা একটি বিধান, সুতরাং ইহার সঙ্গে অন্যান্য বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা নূতন বিধান সুতরাং অপরাপর সমুদায় বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন। একটির পর আর একটি এইরূপে যতগুলি বিধান সৃষ্টি আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহার পূর্ণতা এই বর্ত্তমান বিধানে সমাধা হইল। যদিও নববিধান হিন্দুস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধ আছে। ইনি একটি ক্ষুদ্র দেশের রাজা নহেন, ইনি বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা। কয়েক জন হিন্দু প্রজা

ইহাঁকে কর দিতেছে, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। জগজ্জননীর ইচ্ছা যে ইনি সমস্ত বিশ্বরাজ্য অধিকার করেন। সেই জন্য দেখ ইহাঁর দক্ষিণ বাহু হিমালয়কে ধরিয়াছে এবং বাম বাহু ইউরোপকে ধরিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সমুদায় ইহাঁর রাজ্যান্তর্গত। কোথায় ইহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধবিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান, কোথায় মুসলমান বিধান, কোথায় শিখ বিধান, সমুদায়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি সমুদায় ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সকল ধর্ম্মকে পূর্ণ করিবেন। ইহার নিকটে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপেক্ষিত হইবে না। ইহাঁর নিকটে যিনি যাহা চাহিবেন তিনি তাহা পাইবেন। যাঁহার যে অভাব তাহা ইনি পূর্ণ করিবেন। এই ন বিধান পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্মের সত্যমালার সমষ্টি। ইহাতে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধানকে টানিতে গেলে, জড়রাজ্য মনোরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি বিজ্ঞানবিরোধী নহেন, ইনি বিজ্ঞানের বন্ধু। নববিধান আকাশের বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা এবং পৃথিবীর সাগর পর্ব্বত সকলের সঙ্গে ঈশ্বরের নামে সংযুক্ত এবং সকল বস্তুর ভিতরে ইনি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম উপলব্ধি করেন। নববিধান আর্য্যজাতি, ইহুদীজাতি, মুসলমানজাতি প্রভৃতি সকল জাতিকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, কাহারও পক্ষে পর নহেন। ইনি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফকীরী বৈরাগ্য, প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদায় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান ঈশ্বরের কোন সামগ্রীকে পরিত্যাগ করেন না। নববিধান, সজন নির্জন, পারিবারিক, সামাজিক, সকলপ্রকার সাধন ভজনের প্রতি অনুরাগী। ইনি ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, অসভ্য সুসভ্য সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি প্রাচীন আধুনিক সকল জাতিকে সম্মান করেন। ইনি বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী সকলকে যথোপযুক্ত আদর ও সম্ভ্রম প্রদান করেন। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক প্রভৃতি ধর্ম্মবিজ্ঞানের

যত গূঢ় সত্য আছে সমুদায় স্বীকার করেন। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। হে নববিধান, তুমি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবিধানের চাবি, যাই তোমাকে অন্যান্য ধর্ম্মসিন্ধুকের কুলুপে সংলগ্ন কবিলাম তন্মধ্যে যত ধর্ম্মরত্ন গুপ্ত ছিল সমুদায় প্রকাশিত হইল। তোমার প্রসাদে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিলাম। ইহুদী, মুসলমান বন্ধুগণ, তোমরা এত দিন গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলে, তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব কেহ বুঝিতে পারিল না, আজ নববিধানের প্রসাদে তোমাদেব আদর হইল। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, তোমাকেও জগৎ ভালরূপে জানিত না, সভ্য ও জ্ঞানীরা তোমাকে অত্যন্ত ঘৃণা কবিত। নববিধানেব আবির্ভাবে তোমার নিগূঢ় তত্ত্বসকল আবিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং তোমার সম্মান বাড়িল। এই নববিধান প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে অমৃত উদ্ধাব করিবেন। ইনি পৃথিবীব সমুদয় ধর্ম্ম হইতে সত্যরত্ন বাহির করিবেন. ইনি সকলকে উদ্ধাব কবিবেন। সকলে ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইনি সমুদায় ধর্ম্মেব সাব লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত করিবেন। ইনি পৃথিবীব সমুদায় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন। সকলেই নববিধানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ইহাঁকে এক দিন প্রণাম কবিবে। আমাদিগেব বন্ধু নববিধান, তুমি এত দিন ছিলে কোথায়? তোমা বিহনে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মুসলমান সকলেই পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিত এবং সকলেই ভ্রাতৃবিরোধনিবন্ধন দুঃখে কষ্টে ম্লান ছিল। তুমি এত কাল কেন আমাদেব মধ্যে আসিয়া বিবাদভঞ্জন করিলে না? নববিধান, আগে যদি আসিতে সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ইচ্ছায় আসিতে পারিতে না। ভগবান্ তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। যাহা হউক, তোমার আগমনে পৃথিবীব আশা ও আনন্দ হইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারি দিক্ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয়।।

ঈশা এবং চৈতন্যের গূঢ়যোগ।

রবিবার ৪ আশ্বিন, ১৮০২ শক।

লোকে বলে যে মহর্ষি ঈশার সঙ্গে ভক্তোত্তম শ্রীচৈতন্যের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত। এই বিবাদের আশু মীমাংসা কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকের এই সংস্কার, শ্রীচৈতন্যের একটি উপদেশ মহর্ষি ঈশার উপদেশের বিরুদ্ধ। দুই জনের দুই বিধি, অথবা এক জনের বিধি এবং অপরের নিষেধ, পরস্পরের প্রতি খড়্গহস্ত। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি সত্য পৃথিবী তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল। পৃথিবী মহামতি ঈশার নিষেধ মানিবে, না শ্রীগৌরাঙ্গের বিধি পালন করিবে? এক জনকে আদর করিলে যদি অন্যের প্রতি অবজ্ঞা হয়, এক জনকে গ্রহণ করিলে যদি অন্যকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তবে পৃথিবীর পাপ হইবে। বুদ্ধি যদি একের ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া অন্যের ধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে বুদ্ধির অপরাধ হইবে। নববিধান বলিতেছেন দুইয়েরই মান্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় দুইয়ের সম্মিলন পৃথিবী তাহা জানে না। পৃথিবী মনে করে, ঈশা এবং গৌরাঙ্গের সঙ্গে এক বিষয়ে চিরবিবাদ থাকিবে। কি বিষয়ে এই দুই জনের বিরোধ? ঈশ্বরের নামগ্রহণসম্পর্কে। ঈশা বলেন "বৃথা অনেক বার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে না, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণসম্পর্কে বহুভাষী হইবে না, নিরর্থক ঈশ্বরের নামের পুনরুক্তি করিবে না, সংক্ষেপে ঈশ্বরের নাম লইবে। বিশ্বাস ভক্তির সহিত এক বার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট। ঈশ্বরের কাছে অল্প কথাতে প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বরের নামসম্পর্কে বহুভাষা, পুনরুক্তি ত্যাগ করিবে। পুনরুক্তি দোষ, ও ঈশ্বরের নামাপরাধ হইতে রসনা ও হৃদয়কে চিরকাল দূরে রাখিবে।" পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্য বলেন,—"অবিশ্রান্ত হরিনাম সাধন করিবে, হরি নাম করিতে করিতে উন্মত্ত হইবে, যত বার পার হরি নাম করিতে করিতে প্রাণকে আনন্দিত করিবে। হরিনামে ক্রমশঃ পুণ্যবৃদ্ধি শান্তিবৃদ্ধি এবং অবশেষে আনন্দোচ্ছ্বাস হইবে।" এই দুই উপদেশ আপাততঃ পরস্পর এত দূর বিপরীত যেমন উত্তর ও দক্ষিণ। তবে কি প্রাণের ঈশা এবং প্রাণের গৌরা-

ঙ্গের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ নাই? তাঁহারা দুই জন কি পরস্পরের বিরোধী? শ্রীচৈতন্যের উপদেশ কি মহর্ষি ঈশার কথার প্রতিবাদ? দুই জন যদি পৃথিবীতে এক সময়ে আসিতেন, তাঁহারা কি পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিতেন, না পরস্পরের মধ্যে গূঢ় যোগ দেখাইয়া দিতেন? নববিধান তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে প্রাণগত গূঢ় যোগ দেখিতে পাইয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে নববিধানের বিচার নিষ্পত্তি জগতে ঘোষণা করা নিতান্ত আবশ্যক। কোন টোলের পণ্ডিত কিংবা কোন বিজ্ঞানবিৎ যাহার মীমাংসা করিতে পারে না, নববিধান তাহার মীমাংসা করেন। আমাদিগের মনে এই আশা হইয়াছে, ধর্ম্মরাজ্যের যত কঠিন গূঢ় সমস্যা আছে নববিধান সে সমুদায়ের মীমাংসার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। নববিধান দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিতেছেন, উল্লিখিত বিষয়ে মহর্ষি ঈশার কথাও ঠিক, ভক্ত শ্রীচৈতন্যের কথাও ঠিক। ভাববিহীন হইয়া বারংবার এক শব্দ উচ্চারণ করিলে হৃদয় কঠোর হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মহর্ষি ঈশা বারংবার নিরর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। বৃথা পুনরুক্তি ঈশার অনভিপ্রেত। বাস্তবিক ভাববিহীন হইয়া যদি বারংবার ঈশ্বরের নাম কর, তাহাতে ঈশ্বরের নামের অবমাননা সুতরাং তোমার পাপ হইবে। ভক্তিবিহীন হইয়া বারংবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলে পরিত্রাণ লাভ করা দূরে থাকুক তাহাতে হৃদয় কঠোর এবং নির্জীব হয়। যদি ভক্তিশূন্য বহুভাষণ দ্বারা স্বর্গ লাভ হইত তাহা হইলে কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের বহুভাষী বক্তাগণ সর্ব্বাগ্রে বৈকুণ্ঠধামে যাইত। কিন্তু স্বর্গ বহুভাষীর জন্য নহে। স্বর্গ বহুভাষী হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। ভাববিহীন হইয়া অনেক কথা কহা পাপ। এক শব্দ এক ভাবে দুই বার উচ্চারণ করা পাপ। শব্দের প্রাণ ভাব। নব নব ভাবের সহিত যদি এক শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিতে পার তাহাতে হৃদয় সরস হইবে, কিন্তু নূতন ভাববিহীন হইয়া যদি এক নাম বারংবার উচ্চারণ কর তাহাতে কপটতা ও কঠোরতা বৃদ্ধি হইবে। আবার এক দিকে যেমন ভাববিহীন পুনরুক্তি অথবা বহুভাষণ পাপ, তেমনি অন্য দিকে সংক্ষেপে দুই একটি উপাসনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরকে

ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণা করা ভয়ানক অপরাধ। যদি সংক্ষিপ্ত উপাসনা অথবা অল্প কথায় জীবের পরিত্রাণ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখনই স্বর্গারোহণ করিত। ভাববিহীন হইয়া অনেক কথা বলাও পাপ, আবার ভাবশূন্য হইয়া অল্প কথায় ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করাও পাপ। মহর্ষির কথা এবং ভক্তের কথা উভয়ই পালন করিতে হইবে, মহর্ষির আদেশানুসারে ভাবশূন্য পুনরুক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্তের আদেশ মতে নব নব ভাবের সহিত বারংবার হরি নাম উচ্চারণ করিয়া প্রেমে মত্ত হইতেই হইবে। উভয়ের উপদেশের গূঢ় ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ লোক এই দুই আপাততঃ বিরুদ্ধ মতের ভাবার্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পায়। অল্পবিশ্বাসী অসাড়হৃদয় লোক সর্ব্বদা ভাবের সহিত ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্য তাহারা প্রায়ই পুরোহিতের উপরে ঈশ্বরোপাসনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সকল দেশেই প্রায় পুরোহিতের দ্বারা দেবপূজা করাইয়া লওয়ার প্রথা দেখা যায়। পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যদি অল্প মূল্যে স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে আর কেন গৃহস্থ নিজে কষ্ট স্বীকার করিবে? নিজের নির্জ্জীবতা এবং সংসারাসক্তি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য নির্ব্বোধ মানুষ প্রতিনিধি দ্বারা পুরোহিতের দ্বারা দেবার্চ্চনা সম্পন্ন করিয়া লয়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা পুরোহিত রাখিতে পারে না। তাঁহাদিগের ব্রহ্মের আদেশ এই যে তাঁহারা অব্যবহিত ভাবে ব্রহ্মের আরাধনা করিবেন, কিন্তু যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে বিমুখ হন, তাঁহারা একটি পুরোহিত দ্বারা ব্রহ্মপূজা নির্ব্বাহ করেন। অন্যান্য লোক এবং ব্রাহ্মের এই প্রভেদ যে অন্যান্য লোকের পুরোহিত বাহিরে, ব্রাহ্মের পুরোহিত তাহার নিজের শরীরের মধ্যে। সেই পুরোহিতের নাম রসনা। যখন হৃদয় মন নির্জ্জীব ও অবসন্ন হয়, যখন ব্রহ্মজ্ঞানী হৃদয় মনের ঐক্য করিয়া একাগ্রতার সহিত ব্রহ্মধ্যান করিতে পারে না, তখন উপাসনার ও সঙ্গীতের পুস্তক খুলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী তাহার নিজের রসনাকে বলে, "হে রসনা পুরোহিত, আজ আমার পরিবর্ত্তে তুমি ব্রহ্মপূজা কর।" যেমন

ওদিকে গৃহস্থ সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, অথচ পুরোহিত তাহার প্রতিনিধি হইয়া প্রত্যহ দেবার্চ্চন করিতেছে, সেইরূপ সাধন ভজনে অলস ব্রহ্মজ্ঞানীর মন সহস্র প্রকার কুচিন্তা করিতেছে, অথচ তাহার রসনাপুরোহিত ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মসঙ্গীতরূপ চণ্ডীপাঠ করিতেছে। অন্য লোকের হাতে পুরোহিতের হাতে পূজার ভার দেওয়া যেমন পাপ, নিজের রসনার উপরে ব্রহ্মপূজার ভার দেওয়াও তেমনি পাপ। অতএব সাবধান, কেহই কখনও মুক্তি অন্বেষণের ভার বাহিরের পুরোহিত অথবা রসনার উপরে দিও না। মনের মধ্যে ভাব নাই, প্রেম ভক্তি নাই, রসনা কতকগুলি শিক্ষিত শুষ্ক স্তবস্তুতি পাঠ করিতে লাগিল, ইহাতে কি প্রকৃত ব্রহ্মপূজা অথবা পরিত্রাণ হয়? তোমার আমার কি একপ করা উচিত? রসনাকে বেতনভুক্ পুরোহিত করিয়া কে কোথায় পরিত্রাণ পাইয়াছে? ভাববিহীন হইয়া রসনা কতকগুলি শুষ্ক স্তবস্তুতি করিবে মহর্ষি ঈশা তাহা সহ্য করিতে পারেন না, এই জন্যই তিনি গম্ভীর ধ্বনিতে বলেন "বৃথা বারংবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিও না।" যদি হৃদয় মন ঈশ্বরের উপাসনা করিতে না পারে তবে অচেতন রসনা কিরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিবে? রসনা একটি বীণাযন্ত্র, রসনা আপনাকে আপনি বাজায় না। রসনাযন্ত্রের এক মুখ বাহিরের দিকে, আর এক মুখ ভিতরের দিকে। ভিতরের মুখ দিয়া রসনা প্রেমরস, ভক্তিরস আকর্ষণ করিবে, বাহিরের মুখে রসনা সেই সুধারস জীবের কর্ণে ঢালিয়া দিবে। এক মুখে রসনা হৃদয়সমুদ্র হইতে ভাবামৃত টানিয়া লইবে, আর এক মুখে তাহা দান করিবে। এক মুখে অমৃতসঞ্চয়, আর এক মুখে অমৃতদান। রসনা রসের আধার। কোথা হইতে রস আনে কেহ জানে না। ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল, যদি সমস্ত শরীর শুষ্ক হয় তথাপি রসনাতে রস থাকে। রসনার মূলদেশে রসসাগর রহিয়াছে। প্রেমরস, ভক্তিরস প্রস্তুত রহিয়াছে। এক মুখে রসনা সেই প্রেমরস, ব্রহ্মরস, অমৃতরস, হরিনামামৃতরস পান করিয়া যখন অন্য মুখে সেই রস জীবের কর্ণে ঢালিয়া দেয়, তখন জীবের পরিত্রাণ হয়। রসনাই কেবল হরিনাম অমিয়ের আস্বাদ বুঝিতে পারে। হস্ত কিংবা অন্য কোন

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মধুর মিষ্টতা বুঝিতে পার না, কিন্তু মধু রসনাতে রাখ, তাহা যেমন মিষ্ট বুঝিতে পারিবে। মধু রসনাতে রাখিবামাত্র তোমাকে আনন্দিত করিবে। সেইরূপ সুমিষ্ট ব্রহ্মনাম রসনার উপরে রাখ, ভক্তি-রসে আর্দ্র করিয়া রসনা দ্বারা বারংবার ব্রহ্মনাম উচ্চারণ কর, যত বার উচ্চারণ করিবে ততই ব্রহ্মনামরস গাঢ়তররূপে সুপক্ব হইয়া আসিবে। পাক ভিন্ন পক্ব হয় না। যতই রসনাযন্ত্রে হরি নাম পাক হয়, ততই সেই নাম মিষ্টতর, মিষ্টতম এবং মিষ্টতম হইতে মিষ্টতর হয়। পাঁচ বার, সাত বার, অনেক বার পাকের পর আরও গাঢ়তর মিষ্ট হইবে। এইরূপে বারংবার হরিনাম উচ্চারণের পর জিহ্বা সেই মিষ্ট নামকে জড়াইয়া ধরিবে। আর কিছুতেই সেই নামের সঙ্গে জিহ্বার বিয়োগ অথবা বিচ্ছেদ হইবে না। তখন অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ কর অপরাধ হইবে না। এই শ্রীগৌরাঙ্গের মত। এখানে ঈশা এবং শ্রীচৈতন্যের গূঢ় মিল হইয়াছে। সা, ঋ, গ, ম, প্রভৃতি সপ্ত স্বরে যত সুর ভাঁজিলাম ততই সেই সুর মিষ্ট হইল। এক মিশ্রী অগ্নির উপরে পাক দেখিলাম, দুই ঘণ্টা পরে গাঢ় মিষ্ট হইল, চারি ঘণ্টা পরে গাঢ়তর মিষ্ট হইল। লোকে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "এমন অনির্ব্বচনীয় মধুরতা কোথা হইতে আসিল?" যে হরি নামে সমস্ত ভক্তদল উন্মত্ত হইয়া পড়ে তাহা সামান্য মিষ্ট নহে। অনেক বার পাকের পরে সেই মিষ্ট নাম প্রস্তুত হয়। অতএব ঈশা এবং চৈতন্যকে পরস্পরের বিরোধী মনে করিও না। ভাববিহীন হইয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করা পাপ, কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন এবং নব নব ভাবে বারংবার ব্রহ্মনাম গ্রহণ কর তোমার ভয় নাই, তোমার পাপ হইবে না। হৃদয়ের ভিতর হইতে প্রেমরস তুলিয়া হরি নাম কর তাহাতে ভক্তি বৃদ্ধি হইবে। যে ভাববিহীন হইয়া কেবল লোককে শুনাইবার জন্য হরি নাম করে তাহারই বিপদের সম্ভাবনা। হরি-নাম করিতে করিতে যদি নিজের মন সরস না হয়, তাহা হইলে জানিবে সেই নাম বৃথা হইতেছে। এমন শব্দ উচ্চারণ করিবে না, এমন বক্তৃতা করিবে না যাহাতে নিজের উপকার না হয়। ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে ভাববিহীন বক্তৃতা করা মহাপাপ। যে বক্তৃতা দ্বারা নিজের

হৃদয়ের পরিবর্তন হয় না, সেই বক্তৃতা করা অপেক্ষা মহাপাপ কি আছে? পরকে শুনাইবার জন্য যে বক্তৃতা করে, অথবা হরিনাম করে, সে মহাপাপী। যদি তুমি ভক্ত হও, তবে তোমার উচ্চারিত প্রথম বারের হরি নাম অপেক্ষা দ্বিতীয় বারের হরি নাম মিষ্টতর হইবে। তুমি নিজে হরি নাম করিয় নিজে সুখী হইবে। নিজের রসনার কথায় নিজে মুগ্ধ হইবে। রসনা বিনা, তোমা দ্বারা হরি নাম মিষ্টতর হইল। আগে পিতা নাম মধুর ছিল, এখন মা নাম আরও মিষ্টতর হইল। এই মা নাম আগেকার ব্রহ্ম নাম হইতে আরও কত মিষ্ট হইয়াছে। এক সময় দয়াময় নাম কত মিষ্ট ছিল। তৎপর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হরি নাম কেমন মিষ্টতর হইয়া আসিল। এখন আমরা সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতর মা নাম পাইয়াছি। এই মিষ্টতম মা নাম এবং সেই পূর্ব্বেকার দয়াময় ও হরি নামে কত প্রভেদ। ভক্তির সহিত বারংবার মা শব্দ উচ্চারণ কর, এক ভাবে মা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিও না, কিন্তু নিত্য নূতন ভাবরসের সহিত মা নাম উচ্চারণ কর দেখিবে হৃদয় ফাটিয়া ভক্তিরস উথলিয়া উঠিবে এবং ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া সেই নাম করিতে করিতে পরিশেষে আনন্দসাগরে মন মগ্ন হইবে। এই যে রসনা বীণাযন্ত্র, এই যন্ত্রে সাত সুরে উনপঞ্চাশ সুরে সেই মা নাম ভাঁজিবে, ভক্তিভাবে যতই অধিক বার ভাঁজিবে ততই ইহা মিষ্ট হইবে। হে রসনা, তোমাকে আমরা চিনিলাম না। কোন নারদের বীণা তুমি, তোমার মধুর স্বরে আমার মনোনারদ মুগ্ধ হইয়াছে। রসনা, তুমি এক মুখে সুধাপান করিতেছ, আর এক মুখে সুধা ঢালিতেছ। রসনা, তুমি ছিলে কোথায়? আসিলে কোথা? স্বর্গের বীণা তুমি, তোমাকে এই মর্ত্ত লোকে কে আনিল? তোমা দ্বারা এই পৃথিবীতে সুখের বৈকুণ্ঠ সৃষ্ট হইল। একে মার নাম মিষ্ট, তাতে কোমল নরম রসনা তুমি, তোমাতে মার নাম সংযোগ হইলে পৃথিবী আর কঠিন থাকিতে পারিবে না। রসনা তুমি খুব ভক্তির সহিত মা নাম সাধন কর। মার নাম ও মা অভিন্ন। "নামেতে তাহাতে নাহিক প্রভেদ।" ভাই, তোমার রসনাবীণাতে সুখমোক্ষদায়িনী মার নাম সংযোগ কর, দ্বরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া মা কে মা বলিয়া ডাক চক্ষে ভক্তিজল পড়িবে, হৃদয়ে ভক্তিরস উথলিয়া উঠিবে।

পৃথিবীর মহাজনগণ।

রবিবার ২০ পৌষ, ১৮০২ শক।

উৎসব নিকটবর্ত্তী। এ সময়ে ঋণচিন্তা আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। সময়োচিত কার্য্য ঋণ আলোচনা। সামান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা বলিবেন, "আমরা দুই জনের নিকট ঋণী, সেই দুই জনকেই কৃতজ্ঞতা উপহার দিব, আর কাহাকেও কৃতজ্ঞতা দিব না।" তাহারা কেবল দুই জন উপকারী বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবে, তাহারা ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক ও ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টিসাধক মহোদয়দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাভাবে প্রণত হইবে। সামান্য ব্রাহ্ম বলেন "এই দুই জনের নিকট আমি ও দেশ উপকৃত, সুতরাং ইহাঁদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।" উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম বলিলেন, "না, আমি কেবল এই দুই জনের নিকট ঋণী নহি, যদি এই সপ্তাহে আমার ও ব্রাহ্মসমাজের ঋণ গণনা করা উচিত হয়, তাহা হইলে অনেক মহাজনের নিকট আমি ও আমার দেশ ঋণী।" দুই জন কেন, শতাধিক ব্যক্তির কাছে আমরা ঋণী। সমস্ত হিসাব পর্য্যালোচনা করা হউক, কোন মহাজনের নিকট কত ঋণ করিয়াছি তাহা দেখা হউক, এমন কত মহাজন আছেন যাঁহারা সুদ পর্য্যন্ত পান নাই। উৎসবের আগে সমুদায় মহাজনদিগের হিসাব পরিষ্কার করিয়া লই। সর্ব্ব প্রথমে যিনি আমাদের সকলকে জীবন দান করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকটে আমরা সকলেই ঋণী। তার পর সাধু মনুষ্যদিগের নিকটে আমরা ঋণী। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু দেশে দেশে, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে ব্রাহ্মসমাজ ঋণী। আপাততঃ দেখিতে গেলে গ্রীক দেশের মহামতি সক্রেটিসের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নাই। গ্রীকদিগের সঙ্গে হিন্দুগণের না ভাষা না ধর্ম্ম, না রাজ্যসম্পর্কে কোন সম্বন্ধ আছে। মহামতি সক্রেটিস এথেন্স নগরের যুবকদিগের গুরু। তিনি আদি মনোবিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে তাঁহার বাস স্থান। বৃদ্ধ সক্রেটিস, তুমি কখনও ভারতবর্ষে এস নাই, তুমি ভারতবর্ষ দেখ নাই, তথাপি ভারতবাসী

কেন তোমার কাছে ঋণী হইল? তোমার নিকটে কিরূপে ভারত মনোবিজ্ঞান শিখিল? বৃদ্ধ সক্রেটিস্, তুমি ভারতে না আসিয়াও ভারতে মনোবিজ্ঞানের গুরু হইয়াছ। তোমার নিকটে ভারত মনোবিজ্ঞানের জন্য ঋণী।

যিহুদিদিগের প্রধান নেতা মুসা, তুমি বহুদূরস্থ যিহুদিদিগের ভক্তিভাজন নেতা ছিলে, তুমি কিরূপে হিন্দুস্থানের শ্রদ্ধা ভক্তির আস্পদ হইলে? হিন্দুস্থানে বড় বড় আর্য সাধু আছেন, যাঁহারা তোমাকে বিজাতীয় ম্লেচ্ছ মনে করেন, এবং তোমার নাম উচ্চারণ করিতে ঘৃণা করেন, তথাপি কিরূপে তুমি নববিধানাশ্রিত ভারতবাসীদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইলে? নববিধান আগমনের পূর্ব্বে তুমি কেবল স্বজাতির নিকটে গৌরব পাইতে, এখন নববিধানের প্রভাবে তুমি ভারতবর্ষের আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইল।

মহর্ষি ঈশা, তুমি পৃথিবীর অনেকাংশ অধিকার করিয়াছ, অনেক জাতিকে তুমি স্বর্গের শোভা দেখাইয়াছ, তুমি অনেকের উপকার করিয়াছ। সূর্য্য তোমার রাজ্যে অস্তমিত হয় না। ইউরোপ, আমেরিকা সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য, কিন্তু আর্য্যজাতি কেন তোমাকে গ্রহণ করিবে? ভারতসন্তান কেন বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত তোমার নাম সাধন করিবে। হিন্দুস্থানের রাজা তুমি নও। অন্যান্য দেশের রাজা হইয়াছ বলিয়া কি তুমি এই দেশের রাজা হইবে আশা কর? দুরাশা তোমার। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, আর্য্য হিন্দুসন্তান কি তোমার পদধূলি লইবে? তুমি বিজাতীয় বিদেশী সাধু, তোমাকে কিরূপে হিন্দুরা গ্রহণ করিবে? সামান্য ব্রাহ্মেরাও বলিতেছে তাহারা তোমার কাছে ঋণী নহে। ব্রাহ্মেরা যে উৎসব করিবে তাহাতে কি তাহারা তোমার নাম করিবে, তোমাকে আদর করিবে? কোন ব্রাহ্ম সরলান্তরে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে পারেন, "আমি এই এই সত্য ঈশার নিকট শিখিয়াছি, কুড়ি হাজার টাকা ঈশার নিকট ঋণ করিয়াছি।" চিন্তাহীন অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মেরা বলিতেছে, "বিজাতীয় মহাজনেরা আমাদের নিকট এক কড়া কড়িও পাইবে না। কিন্তু প্রত্যেক সরল ব্রাহ্ম উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমুদায় বিদেশীয় মহাজনদিগের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিতেছেন বিদে-

শীয মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘরে আসিয়া দেখি সমুদায় হিন্দু মহাজনেরাও আমাদিগের কাছে দাওয়া দাবি করিতেছেন। যোগপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুভক্ত নারদ, প্রজাবৎসল রাম, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং ভারতের অন্যান্য সমুদায় সাধু ও মহাত্মাগণ আমাদিগকে রাশি রাশি সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিজনের নিকটে আমরা ঋণী। কৃতবিদ্য দাম্ভিক যুবা সগর্ব্বে বলিতে পারে "আমি বেদ পুরাণের কুসংস্কার ভ্রম হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমি কিরূপে মন্ত্র তন্ত্র, রাম সীতা গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতিকে মানিব?" অহঙ্কারী যুবা বলিতে পারে "যেমন আমি বিদেশীয় মহাজনদিগের নিকট ঋণী নহি তেমনি দেশীয় কোন মহাজনের নিকটেও আমি ঋণী নহি।" অহঙ্কারী ব্রাহ্ম বলিতে পারে, "আমি প্রাচীন কোন মহর্ষির নিকট ধ্যান শিক্ষা করি নাই, আমি নূতন প্রণালীতে ধ্যান করি, আমার ধ্যান নিজস্ব, সুতরাং এই বিষয়ে আমি প্রাচীন যোগী ঋষির গুরুত্ব কেন স্বীকার করিব?

আর এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্ম, তুমি এই মহাজনের নিকটে কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছ? ব্রহ্ম হাসিয়া বলিলেন "আমি কি বুদ্ধের ন্যায় নির্ব্বাণ সাধন করি? বুদ্ধের নিকটে কিরূপে আমি ঋণী হইলাম?" শাক্যসিংহের শেষ জীবন কি হইল? তিব্বতদেশে, চীনদেশে, লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইল, কিন্তু হিন্দুস্থানে তাঁহার নাম লোপ হইল। হিন্দুস্থানে শাক্যসিংহের নাম লোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানের অস্থির ভিতরে শাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাক্যের নিকটে ব্রাহ্মেরা অশেষ ঋণে ঋণী।

আরও নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ওহে ভক্তির অবতার চৈতন্য, তুমি কি ব্রাহ্মদিগকে কিছু ঋণ দিয়াছ? জ্ঞানগর্ব্বিত ব্রাহ্ম বলিতেছে, ব্রাহ্মের ভক্তির সভ্যতার ভক্তি, ব্রাহ্মের ভক্তি বৈষ্ণবদিগের অন্ধভক্তি নহে। সভ্য ব্রাহ্ম জিজ্ঞাসা করেন, ব্রাহ্মেরা কি বৈষ্ণবদিগের ন্যায় দশাপ্রাপ্ত হয়? ব্রাহ্মেরা কি প্রেমোন্মত্ত হইয়া অচেতন হয়? জ্ঞানী সুসভ্য ব্রাহ্মেরা কেন শ্রীচৈতন্যকে মানিবে? চৈতন্য আপনার স্ত্রী সন্তান প্রভৃতি ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন,

ব্রাহ্মেরা সংসার ত্যাগ করা অধর্ম্ম মনে করেন, সুতরাং ব্রাহ্মেরা চৈতন্যকে কিরূপে ভক্তি দিবেন। হে অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, কি স্বজাতীয়, কি বিজাতীয় কোন মহাজনের নিকটে তুমি ঋণ গ্রহণ কর নাই এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে তুমি ব্রহ্মোৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছ; কিন্তু দাঁড়াও, গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, যথার্থই তুমি অঋণী কি না। ভয়ানক ঋণের ভার কমাইবার জন্য তোমার মনে অকৃতজ্ঞতা এবং নীচ ভাবকে মনে স্থান দিও না। অনন্ত ঋণে তুমি ঋণী, সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক জীবের নিকটে তুমি ঋণী। সৃষ্টির দিনে যে সত্য সূর্য্য উদিত হইল, যে প্রেমচন্দ্র আকাশে উদিত হইল, তাহার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। প্রত্যেক দেশের কি স্বজাতীয় কি বিজাতীয় সকল গুরুর নিকটে তুমি সত্যঋণে ঋণী। প্রত্যেক গুরুর পদতলে তুমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিবে। নববিধানের ব্রাহ্ম, তুমি কোন জাতির সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। ঈশা, মুষ, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই তোমার ভক্তি-ভাজন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুদিগকে সমাদর করে। খ্রীষ্টান কেবল খ্রীষ্ট এবং বাইবেল, মুসলমান্ কেবল মহম্মদ ও কোরাণ, শিখ কেবল নানক ও গ্রন্থকে আদর করে, কিন্তু নব-বিধানের লোকের নিকট বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র আদৃত। নববিধানের লোকের ঋণ অনেক। এই ঋণনদী যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কত দূর গিয়াছে কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। এই নদী কেবল অস্মদ্দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বদ্ধ নহে। ইহা কেবল ভারতের বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ঋণে ঋণী নহে, কিন্তু এই ঋণনদী সমস্ত এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সমুদায় ভূমি হইতে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর সমুদায় জ্ঞানী পণ্ডিত ধার্ম্মিক সাধু-দিগের ঋণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা এই ভয়ানক ঋণভার হইতে মুক্ত হই। যে ব্রাহ্ম দর্প করিয়া বলে যে আমি কাহারও নিকটে ঋণী নহি, দর্পহারী ঈশ্বর তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন। হে ভ্রান্ত অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, তুমি কি এক বার বিচার করিয়া দেখিলে না যে তোমার ধর্ম্মজীবনের প্রত্যেক রক্ত বিন্দুর মধ্যে পৃথিবীর সাধু মহাজনদিগের

ঋণ রহিয়াছে। তুমি কি এক বার ভাবিয়া দেখিলে না যে, কাহার নিকটে তুমি ব্রহ্মস্তবস্তুতি ব্রহ্মারাধনা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিখিলে, কাহার নিকট তুমি সংসারে বৈরাগ্যসাধন শিখিলে। তুমি যে আপনার রাজ্য মধ্যে বিবেককে রাজসিংহ সনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি কাহার নিকটে শিখিলে? তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিতেছে আমার গুরু অমুক অমুক। পৃথিবীর সমুদায় মহাজনদিগের নিকটে ধারে তুমি বিক্রয় হইয়া গিয়াছ। সাধুদিগের নিকটে তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রী হইয়াছে। অমুক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী, অমুকভাব আমা হইতে পাইয়াছে, আর এক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক দৃষ্টান্ত আমা হইতে পাইয়াছে। মিসর দেশ, আরব দেশ, চিন দেশ পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলিতেছে, বাঙ্গালীর মাথার মুকুটে যত রত্ন আছে সমুদায় আমাদের হইতে। তবে কেন দাম্ভিক ব্রাহ্ম তুমি বলিতেছ যে তুমি কাহারও নিকটে ঋণী নহ। তোমার বাড়ীতে যেমন দশখানি সামগ্রী দশ স্থান হইতে আনীত, তোমার ধর্ম্মের ভাব সকলও সেইরূপ নানা স্থান হইতে সংগৃহীত। যখন পৃথিবীর সমুদায় মহাজনেরা আপন আপন ঋণের কথা বলিলেন, তখন গুরুতর কৃতজ্ঞতার ভারে ভারতের মাথা অবনত হইয়া পড়িল। অবিবল হওয়া পাপ। ঋণ অস্বীকার করা ও অসত্য বলা পাপ। আমাদের মস্তক ধারে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ভারতমাতা আমাদিগকে বলিতেছেন, "ব্রাহ্মগণ, যদি সত্যই তোমরা আমার সুসন্তান হও, তবে আমাকে আর ঋণী রাখিও না, ঋণ পরিশোধ কর। ভারত যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে কত ধার করিয়াছেন তাহা গণনা করা যায় না। ইংরাজ রাজা ভারতকে কত ঋণ দিয়াছেন। রাজ্যসম্পর্কে সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে ভারত ইংলণ্ডের নিকট কত ঋণে ঋণী। ভারত, তুমি কি ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ এবং কবিদিগকে অস্বীকার করিতে পার? বিলাতের বিজ্ঞান, কবিত্ব ভারতকে কত উন্নত করিয়াছে। বিলাতের উন্নতিকর ও মঙ্গলময় বিজ্ঞানাদি ব্যতীত ভারতের দিন চলে না। যেমন এক দিকে বিদেশীয় মহাত্মারা ভারতের কৃতজ্ঞতাকর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্য দিকে ভারতের আপনার বুদ্ধ, ব্যাস, কবীর, নানক প্রভৃতি সকলে দাঁড়াই-

লেন, আর ভারত সকলের চরণে প্রণাম করিলেন। কত লোকের কাছে ভারত ঋণ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা করা যায় না। অতএব ব্রাহ্মগণ, তোমরা বিবেচনা কর, আলোচনা কর, কায়মনোবাক্যে মার ঋণ পরিশোধ কর। ঋণ স্বন্ধে করিয়া যোগীর গুণ, ভক্তের গুণ কীর্ত্তন কর। আনন্দমনে সাধু মহাত্মগণের গুণগান করিতে করিতে উৎসবে যাত্রা আরম্ভ কর। পৃথিবীর মহাজনদিগের চরণ ধরিয়া বল, দেও বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্ব্বাণ নিশান দেও, মহর্ষি ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছাপালনের নিশান দেও, মহম্মদ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নিশান দেও, শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি আমাদিগকে হরিপ্রেমোম্মত্ততার নিশান দেও। কৃতজ্ঞতা, বিনয়, নম্রতা সংকারে সেই মহাজনদিগকে স্মরণ কর। মহাজনদিগের কাছে সাধুতা ও সত্যরত্ন সকল লইতেই হইবে। অদ্যকার দিন মহাজন স্মরণের দিন। আজ সাধু মহাজনদিগের নামে এই মন্দিরের প্রাচীর সকল সুশোভিত হইল। তাঁহাদিগের সাধুজীবনের শোণিত এই মন্দিরের উপাসকদিগের শোণিতে প্রবেশ করুক। আমরা কেবল হিন্দুস্থানে বসিয়া আছি তাহা নহে। বিশ্বেশ্বরের সমুদায় বিশ্বমধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। হৃদয়, আজ পৃথিবীর সমুদায় সাধুদিগকে প্রণাম কর। তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণে প্রমাণ।

রবিবার ১০ শ্রাবণ, ১৮০১ শক।

ব্রাহ্মসমাজের ইহা অন্যায় যে এক জন ব্যক্তির স্কন্ধে সমুদায় দায়িত্ব স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের কথা সকলেরই বলা কর্ত্তব্য। যদি আমরা সকলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া চলিয়া থাকি তবে কেন তোমরা এক জন বা পাঁচ জনকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া সকলের বিশ্বাসকে অল্পসংখ্যকের বিশ্বাস বলিয়া প্রতিবাদ কর, ইহা ভাল দেখায় না। সত্যের অনুরোধ হইতে মনুষ্যসমাজের অনুরোধ অধিক মনে করা ন্যায়সঙ্গত

নহে। যখন সকলে একত্র যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, এক মত এক ঈশ্বর এক বিশ্বাসে এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি তখন চলিতে চলিতে স্খলন কয়েককে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া তোমরা তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতেছ, মিথ্যাবাদী, কুসংস্কারী, মূর্খ, অবিশ্বাসী, সাধনবিহীন বলিতেছ। পূর্ব্বের মত, বিশ্বাস, মন্ত্র, গুরু, দীক্ষা সকল অস্বীকার করিতেছ, পূর্ব্বে যাহাদিগের সহযাত্রী ছিলে তাহাদিগকে উপহাস করিতেছ, নিন্দা করিতেছ, ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। ব্রহ্মসঙ্গীতপুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তি, অনেক ভাব, অনেক সত্য রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত আর এক গুরুতর বিষয়ে উহা সাক্ষী আছে। কোন্ সময়ে কোন্ মত ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়াছে ব্রহ্মসঙ্গীত ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকটে বিশেষতঃ মনুষ্যের নিকটে সাক্ষ্য দিতেছে। ভাবী ইতিহাসলেখকের নিকট সঙ্গীতপুস্তক সাক্ষ্যদান করিবে, অমুক সময়ে অমুক মত প্রচলিত ছিল। সমস্ত ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বলিবে অমুক সময়ে অমুক ভাব, অমুক সময়ে যোগ, অমুক সময়ে বৈরাগ্যের ভাব প্রবল ছিল। এই ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মশ্রবণের কথা, যোগ ধ্যানের কথা, ব্রহ্ম সহ নিগূঢ়সম্বন্ধস্থাপনের কথা সাক্ষ্য দিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত এই সকল ব্যাপারে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মসঙ্গীত গুরু হইয়া সমস্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা ব্রহ্মের নিকটে যে মন্ত্র শিখিলাম তাহার প্রমাণ সঙ্গীত। সকলে উহা গান করিয়াছেন, ঈশ্বরসমক্ষে বন্ধুগণসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, এখন অস্বীকার করিলে সঙ্গীতপুস্তক দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। ব্রহ্মদর্শন কেহ অস্বীকার করিতে পার না, সঙ্গীতে উহা বদ্ধ হইয়াছে। হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব সঙ্গীত দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি ব্যক্তিবিশেষে এই মত বদ্ধ থাকিত, যদি কোন সাধক কোন ব্রাহ্মযোগীর নিকটে ঈশ্বরপরিচয় হইত, তাহা হইলে সাধারণের মত বলিয়া বিচারিত হইত না। এই সকল গান যদি সাধারণের হয় ইহা কেবল নির্জ্জনে বদ্ধ থাকিতে পারে না, ব্যক্তিবিশেষের হইতে পারে না। শত শত লোক উচ্চারণ করিয়া জগতের সমক্ষে ক্রমাগত এই মত প্রকাশ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকেরা এই সকল পাঠ করিবেন,

তাঁহাদিগের নিকটে এ সকল সহজ কথা নহে। তাঁহারা যখন দেখিবেন, বড় বড় যোগী নহে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণ নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন লিপিবদ্ধ আছে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ব্রাহ্মসমাজ ঋষি যোগী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগধর্ম্ম ঋষিধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। তোমাদিগকেও এখন একথা স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের কথা শুনা যায়, কেবল তোমরা মুখে বল নাই, গান দ্বারা এ মত স্বীকার করিয়াছ। এখন যদি এই কথা বল ইহা অধিকাংশের মত নহে, দু পাঁচজনের মত, অধিকাংশের পুস্তকে যে মত, তাহা খণ্ডন করিবে কি প্রকারে? এখন কি আর অল্প বিশ্বাসিগণের মধ্যে গণিত হইতে চাও। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, এখন বলিতেছ, ভবিষ্যতেও বলিবে এই প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। এক সময়ে ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, কঠোর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, এখন যদি না হয়, তবে অবিশ্বাসের পথে গিয়াছ বলিতে হইবে। ঈশ্বর কথা কন, দিবারাত্র তাঁহার কথা শুনিতেছ, ইহা যদি বলিতে পার, তবে বলি বিশ্বাসের রাজ্য সুদৃঢ় হইতেছে। ঈশ্বর দেখা দেন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা যায় স্বীকার করিয়াছ, সঙ্গীত উহার সাক্ষ্য দিতেছে। এখন যদি বল তিনি কেবল যোগীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তিনি কি সকলের নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, মানুষের ন্যায় কথোপকথন করেন, তবে তাহা মানিব না। পূর্ব্বে এ সকল স্বীকার করিয়াছ ব্রহ্মসঙ্গীত পৃথিবীর নিকটে বলিবে। এখন এরূপ বলিলে নাস্তিক বলিয়া খ্যাতি হইবে। এক বার যাহা বলিয়াছ সত্যের অনুরোধে তাহা অস্বীকার করিতে পার না। যদি বীজমন্ত্রের প্রতিবাদ কর তবে যে অবিশ্বাসী হইলে। যদি পূর্ব্বের কথা সকল অস্বীকার কর, ব্রহ্মসঙ্গীত মিথ্যা বলিয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেল, ব্রহ্মবীজমন্ত্র গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দাও। এক বার সত্য স্বীকার করিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পার না। যাহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহা উৎপাটন করিলে আপনি উৎসন্ন হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ যাহা এত দিন মানিত, তাহা কি এখন অল্প কয়েক ব্যক্তিতে বদ্ধ হইবে? কেহ কেহ যোগ করেন, অধিক হয়তো ৫০ জন হইবে তাঁহারাই কি এখন দর্শন শ্রবণের কথা বলিবেন? ব্রহ্মযোগী স্বতন্ত্র বিধি

স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মদর্শন করেন, অন্তাধিক ব্রহ্মকে বুঝিতে পারেন, নিজ নিজ জীবনে ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করেন, যদি এইরূপ হইল তবে এত দিনে উন্নতি কি হইল? এখন আন্দোলনায় পড়িয়া বিপাকে পড়িয়া কি সকলে বলিবেন, এ মতে দুই পাঁচ জন বিশ্বাস করে। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের পক্ষে ইহা সাজে না। পরীক্ষার সময়ে দুই একটি প্রহার বা নিন্দায় বলিবে, কৈ আমরা বলি নাই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় বা তাঁহার কথা শুনা যায়, আমরা এ কথা শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া থাকি। কয়েক জন অহঙ্কারী হইয়া নিরাকার ঈশ্বরকে স্পর্শ করে, দেখে ও শুনে। দর্শন আদেশশ্রবণ ইহাতে আমাদের হস্ত নির্লিপ্ত, ও মন্ত্র তন্ত্রে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কখন আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। মনে হইতেছে এই বলিয়া অধিকাংশ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সত্যকে ফেলিয়া দিয়া সরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহার আশু প্রতিফল অবিশ্বাস নাস্তিকতা। নিরাকারের বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিলে আর কি থাকিল? যে মত ব্রাহ্মধর্মের ভূষণ তাহাই পরিত্যাগ করিতে চলিলে। ব্রাহ্মধর্মের যাহা শিরোভূষণ, ব্রাহ্মধর্মের যাহা নিজস্ব ধন তাহা পরিহার করিলে আর আর মত লইয়া কি হইবে? আর আর মত কি অন্যান্য ধর্মে নাই? যোগের শাস্ত্রও অন্যত্র আছে? কিন্তু নিরাকার পুরুষকে অন্তরের সহিত ভালবাসা কোথাও নাই। আর সব প্রাচীন বলিতে পারা যায়, কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা ভালবাসা, তাঁহার কথা শ্রবণ করা, তাঁহাকে দেখা, আর কোথাও নাই।

তোমরা জগতের নিকট নিরাকার ঈশ্বর দর্শন তাঁহার কথা শ্রবণ, তাঁহাকে অনুরাগ করার কথা বলিবে, পৃথিবীকে এই শুভ সংবাদ দিবে, ইহার মর্য্যাদা পরে লোকে বুঝিয়া সাধুবাদ প্রদান করিবে, ধন্যবাদ দিবে। ব্রাহ্মগণ যে অমৃত রাখিয়া যাইবেন, উহা দশশতাব্দী পরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। যেমন সাকারকে দেখা যায়, তেমনি নিরাকারকে হৃদয়ে ধারণ, তাঁহার নিরাকার মুখ হইতে কথা শ্রবণ, ইহাতে একান্ত সুখী হইবে। এ কিছু সামান্য কথা নয়। তোমরা যে সত্য উদ্ভাবন করিলে তোমাদের নিকট তাহার আদর যদি না হয়, অন্য দেশের

নিকট তাহা সমাদৃত হইবে। তোমরা যে গান করিয়াছ সে গান শেষ হইল, কিন্তু সেই সুন্দর সঙ্গীত পৃথিবীতে পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিল, তোমাদের এই হৃদয়ের গান ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আদর করিবে; পৃথিবীর ধর্ম্মপথে অনুসন্ধান করিয়া এই ফুলের মালা লাভ করিবে, তাহারা এই মালা গলায় পরিয়া সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের পূজা করিবে।

আমার আজ বেদী হইতে এই বক্তব্য যে, তোমাদের দেওয়া সত্য শত সহস্র বৎসর পরে কেমন আদৃত হইবে। এই মন্দির যেখানে এই সত্য তোমরা প্রকাশ করিয়াছ, যদি সে সময়ে তোমরা আসিতে পারিতে, দেখিতে কত লোক তাহার কিরূপ আদর করিতেছে। তাহাদের চক্ষু হইতে কেমন প্রেমের ধারা পড়িতেছে নিরাকারকে দেখিয়া কেমন প্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছে। সকল মনুষ্য সহজে তখন তাঁহার নিরাকার প্রেমমুখ দর্শন করিতেছে। কোন যুক্তি তর্ক নাই, সমস্ত পৃথিবী এই সত্য সহজে সাধন করিতেছে। আজ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি করিবে বলা হইল, কিন্তু আমরা যে সত্য লাভ করিলাম আমরা নিজে কেন তাহা হইতে বঞ্চিত হই। সকলে মিলিয়া সবল ভাবে যে সঙ্গীত করিয়াছি, এখন সেই সঙ্গীত অনুসারে কেন বলিব না, নিরাকারের তন্ত্র মন্ত্র দুজনের মত নয়, ইহা সকলের মত। জগতের উৎপীড়নের ভয়ে নিরাকার দর্শন শ্রবণের মত মিথ্যা এ কথা যেন মুখ হইতে বাহির না হয়। ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাক্ষী আছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা শুনা যায়। যাহা মানিয়াছ তাহা স্থাপন করিতে হইবে। মিথ্যা কথা কখন বলিতে পার না, ইহা যে আমাদিগের প্রাচীন তন্ত্র। এ জন্য দশ জন কেন রক্ত দিবে আমরা সকলে মিলিয়া ইহার জন্য রক্ত দিব। পাঁচ জন এ জন্য উৎপীড়ন সহ্য করিবে, আর তোমরা উপহাস করিবে উৎপীড়ন করিবে, সংসারের সহায়তা করিবে, ইহা কখন ন্যায়সঙ্গত নহে। যখন দর্শন শ্রবণের সঙ্গীত মুখে আনিয়াছ তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হও। নিরাকারকে দেখা যায় না, তাঁহার কথা শুনা যায় না, পৃথিবীর এই অবিশ্বাসের কথার প্রতিবাদ কর। সেই গান মনে কর সেই সঙ্গীত করিতে থাক, প্রাচীন ভাব পুনরুদ্দীপন কর, তখন দেখিবে নিরাকারে

জ্বলন্ত বিশ্বাসে কিরূপ সুখী হও। প্রায় ৫০ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মমন্দির হইতে দর্শন শ্রবণ বিষয়ে উচ্চ উচ্চ কথা অনেক সময়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দক্ষিণে বামে রাখিযা মধুর সঙ্গীত করা হইয়াছে। সেই সকল কথা অমৃত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার রূপ চক্ষের ভূষণ, তাঁহার কথাশ্রবণ কর্ণের ভূষণ হইয়াছে। ইহা কত দূর হইয়াছে জীবন ও চরিত্র প্রকাশ করিবে। নিরাকার ঈশ্বর কেমন সুখপ্রদ ইহা শিখাইবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরের প্রত্যেক উপাসককে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদিগের প্রতিজনের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব রহিয়াছে। যাঁহারা এই সকল সঙ্গীতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এ বিষয়ে দায়ী। পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস গ্রহণ করিলে জীবন কিরূপ হয়। পৃথিবী বলিবে তোমরা নিরাকার বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিযাছ তাহার উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে চাই। কে বলিতে পারে যে এরূপ হইবে না, দশ বৎসরের পরে এই রাজপথ দিয়া যাহারা চলিবে, তাহারা আমাদিগকে বলিবে তোমরা নিরাকারের কথা কও শুনিব। যদি তোমরা তাহাদের কথায় উত্তর না দাও তোমাদিগকে অবিশ্বাস করিবে, অশ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার রূপের মধুরতার কথা গান করিলে, বল তাঁহার রূপ কেমন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর কি? চক্ষু যাঁহাকে দেখে নাই, কর্ণ যাঁহার কথা শুনে নাই, তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ শুনিযাছ, সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে। হাঁ, আমরা দেখিয়াছি আমরা তাঁহার কথা শুনিয়াছি, সহজ ভাবে তাঁহাকে দেখা যায়, সহজ ভাবে তাঁহার কথা শুনা যায়, ইহা তোমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইবে। বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার করিয়া সাকার ঈশ্বর অনাবশ্যক জগদ্বাসীর নিকট সপ্রমাণ করিতে হইবে। নিরাকারকে দেখ, স্পর্শ কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর। সকলে উদ্যোগী হও, তোমাদিগকে এ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যথোচিত পুরস্কৃত হইবে।

যেখানে ঈশ্বর সেখানে ভক্ত।

রবিবার ১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক।

ভক্তিশাস্ত্রের একটী কথা যোগশাস্ত্রের সাহায্যে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। মনটি ভক্তশাস্ত্রের, কিন্তু যে আলোকে তাহা বুঝা যায় তাহা যোগ শাস্ত্রের। যখনই মনুষ্য ঈশ্বরকে ডাকে, তখন সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক ঈশ্বর সশিষ্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর একাকী দেখা দেন না। ভক্তবৃন্দ সহ তিনি দেখা দেন। তিনি যখন আবির্ভূত হন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাধু ভক্ত সুসন্তানগণও প্রকাশিত হন। ইহার গূঢ়তত্ত্ব কি? কেন ঈশ্বর ভক্তদিগকে লইয়া আসিবেন? যোগশাস্ত্রে কথিত আছে, যোগ দ্বারা সাধকের প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রথিত হয়। যোগ সহকারে যোগী ঈশ্বরকে ক্রমে ক্রমে প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ফেলেন। যেখানে যোগী বসিয়া আছেন, সেখানেই পরমাত্মা। যোগীর হৃদয় ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট, অতএব অন্যান্য যে সকল যোগী ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাও যোগীর সঙ্গে গ্রথিত। যেখানে ঈশ্বর সেখানে তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ বসিয়া আছেন। যেখানে ঈশ্বর সেখানে ভক্তবৃন্দ, যেখানে ভক্তবৃন্দ সেখানে ঈশ্বর। স্বর্গ কখনও খালি হইয়া আছে, ইহা, ভাবিতে পার না। অতএব ইহা সত্য কথা যে ঈশ্বরকে ডাকিলে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ভক্ত সাধকগণও আসেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নবক অভক্ত ভাবিতে পার না। ভক্তকে প্রত্যাহার করিলে ভক্তবৎসলকে পাইবে না। ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই স্বর্গের ঈশ্বরকে, ভক্তবৃন্দের ঈশ্বরকে ভাবিতে হইবে। স্বর্গে দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, যোগী প্রভৃতি ঈশ্বরের পার্শ্বস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তগণের হৃদয়ে বিহার করিতেছেন। কোন্ ভক্ত কোন্ জাতির প্রতিনিধি, কি কি নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন এবং কি নামে তিনি স্বর্গে আখ্যাত তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এই জানি ঈশ্বরকে আদর করিলে তাঁহার ভক্তদিগকে আদর করিতেই হইবে। সকল জাতি এবং সকল যুগে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত যত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,

ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সকলেই ভক্তহৃদয়ে শুভাগমন করেন। কেহ কেহ কেবল এক একটি ভক্তকে জানেন এই জন্য তাঁহারা বলেন, যখন ঈশ্বর আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের অমুক ভক্তিভাজন আচার্য্য অমুক ভক্তবন্ধু আসিবেনই আসিবেন। ঈশ্বর সেই ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, সেই ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাঁরা অন্যান্য ভক্তদিগের তত্ত্ব জানেন না, অতএব সমুদায় ভক্ত যে ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারেন না। ভক্ত ভক্তবৎসলের সঙ্গে আছেন, এই জন্য যত ভক্তকে ভক্তি করি তত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হয়। আবার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হইলে ভক্তের প্রতিও সমাদর বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ভক্তিসাধন দ্বারা সমুদায় ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বর কিরূপে সংযুক্ত আছেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত দেখ স্বর্গের এক জনকে পাইলেও কত রত্ন পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে না দেখিতে পাইলে কোন ভক্তকে পাওয়া যায় না। ভক্ত বলিয়া আমরা যে একটি মনুষ্যকে পূজা করিব তাহা নহে। আমরা কেবল ঈশ্বরকেই ডাকিব। আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, ঈশ্বর তাহা প্রশস্ত করিয়া লইবেন, এবং তাহাতে তাঁহার ভক্তদিগের স্থান করিয়া দিবেন। আমাদের মন ক্ষুদ্র, আমরা কোন ভক্তের নাম শুনিতে চাই না, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করিবেন, তখন সেই অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ভক্তিভাজন হইয়া উঠিবেন। সেই রক্ত মাংসের পিণ্ড মানুষ আমাদের ভক্তিভাজন নহেন, কিন্তু তাঁহার আত্মার ভক্তিভাব আমাদের ভক্তি উদ্দীপন করিবে। পৃথিবীতে ভক্তের কি নাম ছিল তাহা নাই জানিলাম, আমাদিগের পক্ষে এই পর্য্যন্ত জানিলেই হইল, অমুক ব্যক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য স্বার্থ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, অমুক লোক পতিতদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আশ্চর্য্য ক্ষমা, ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা সহকারে আত্মজীবন দান করিয়াছিলেন, অমুক ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিবামাত্র মত্ত হইয়া যাইতেন, অমুক সাধক দিবা নিশি প্রগাঢ় ধ্যান যোগ সাধনে মগ্ন থাকিতেন। অমুক লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,

এবং সকলের পদানত বিনীত দাস হইয়াছিলেন। কাহার বুকের ভিতর স্বর্গের কি ধন আছে তাহাই আমরা দেখিব, তাঁহাদের নামে আমাদের প্রয়োজন কি ? ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাঁহার মনে ব্যাকুলতা এবং বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তিনি এক জন ভক্ত, তাঁহার আর কিছু জানিবার আমার আবশ্যক নাই। পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে তিনি এক জন ভক্ত, ঈশ্বরের নামে যাঁহার মন গলে তিনি এক জন ভক্ত। ঈশ্বর সহবাসে যিনি বসিয়া থাকেন, ঐ সহবাস যাঁহার ভাল লাগে, তিনি একজন ভক্ত যোগী। ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিবার জন্য যিনি আপনার ভাই ভগিনীদিগের সেবা করেন তিনি একজন ভক্ত। ইহাঁদের সকলকেই ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে লইয়া বসিয়া আছেন, ইহাঁদের এক জনকেও অভক্তি করিলে ঈশ্বরকে অভক্তি করা হইবে। যে পরিমাণে আমাদের ভক্তি বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে ইহাদের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ হইবে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িলে, ইহাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িবে। যত টুকু আমরা ভক্ত হইব, তত টুকু আমরা অন্য ভক্তকেও ভক্তি করিতে শিখিব। ঈশ্বরের জন্য যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব, ঈশ্বরের নামে যিনি মত্ত তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব। ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, বিনয়, বিশ্বাস, ক্ষমা সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, প্রেম, নির্ভর, আনুগত্য, যে কোন ব্যক্তির জীবনে এ সকল ভক্তির লক্ষণ দেখিব তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব। ঈশ্বর মধ্যস্থলে সশিষ্য বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের প্রকাশ ভক্তদিগের মুখে দেখিব। যত ভক্তদিগকে ভক্তি করিব তত ভক্তবৎসল আমাদের আয়ত্ত হইবেন, অতএব কোন ভক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চেষ্টা করিও না। প্রাণ যদি ঈশ্বরকে দাও তিনি যদি তোমাদের প্রিয় হন, তাঁহার সমস্ত ভক্তগণও তোমাদের প্রিয় হইবেন, কেননা ভক্তদিগের সঙ্গে তাঁহার নিগূঢ় যোগ। এই জন্য প্রথমেই বলিয়াছি, যোগশাস্ত্র দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রের একটি সত্য স্পষ্টতররূপে বুঝা যায়।

ঈশ্বরপ্রেরিত।

রবিবার ২৩ আষাঢ, ১৮০১ শক।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কোন গুরুতর বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে, সেই বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কিছু অধিক বিশ্বাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আমি বলি ব্রাহ্মসমাজ দেবতার খেলা। উহা যে দেবতার খেলা তাহার প্রমাণ আছে। ব্রহ্মলীলার নাম ব্রাহ্মসমাজ। বর্ত্তমান কালে বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে পক্ষে পক্ষে সপ্তাহে সপ্তাহে দিবসে দিবসে, আরো বলি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মরাজ্যে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে তৎসমুদায় ব্রহ্মলীলা। কেন না ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নহেন, জগৎ-ক্রিয়া ধর্ম্মজগতের বিশেষ ক্রিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মসমাজের লীলার মধ্যে মানুষ আছেন, যাঁহারা ব্রহ্মের পক্ষ। অবশ্য তাঁহারা অল্প-সংখ্যক যাঁহারা ধর্ম্ম বিতরণ করিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, গভীর উচ্চতর তত্ত্ব নিজ জীবনে সাধন করিতেছেন। এই সকল সাধক আচার্য্য বা প্রচারককে আমি বলি "ঈশ্বরপ্রেরিত"। আমি "ঈশ্বপ্রেরিত" বলি, নির্ভয় হইয়া বলি, বলিব মনে করিয়াই বলিতেছি। এই সকল লোক ঈশ্বরপ্রেরিত ব্রাহ্মসমাজ এই ভাব গ্রহণ করিবেন, বরণ করিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এ কথা লইয়া বিবাদ হইয়াছে, হয়তো চারিদিকের লোকেও বলিতেছে, আমরা উহা স্বীকার করি না। লোকে বলিতেছে, যাঁহাদিগকে প্রেরিত বলিতেছি তাঁহারাও বিরুদ্ধে বলিতেছেন। উভয় দিকেই মত বৈপরীত্য, বিবাদ বিসংবাদ। যাঁহাদিগেরই হস্ত স্পর্শ করিয়া বলি তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহারাই অস্বীকার করেন, "আমি নই আমি নই" বলেন। যিনি আপনাকে অস্বীকার করেন, জগৎ তাঁহাকে কেন স্বীকার করিবে? তথাপি আমি স্বীকার করিব। সময়ে স্বীকার হয়, অসময়ে হয় না। ফল পরিপক্ব না হইলে কি তাহাকে ফল বলিতে পারা যায় না? তবে স্বীকার বিলম্বে কেন হইবে? যাঁহারা প্রেরিত তাঁহারা কেন আপনাদিগকে সমাদর করেন না? এ স্থলে সমাদর না করা পাপ ও অবিশ্বাস।

তোমরা বলিবে ইহাতে অবিনয় হয়। তবে অসত্য কি বিনয়? হস্তী যদি আপনাকে কীট বলে তাহা কি বিনয়? তাহা বিনয় নয়, কিন্তু অসত্য এবং কলঙ্ক। তোমরা বলিবে হউক, আমরা ইহাতে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়াও মনুষ্যসমাজে বিনয়ী বলিয়া সমাদৃত হইব। আমি তোমাদের এ চরিত্র ভাল বলি না। পবিত্রাণের সংবাদ তোমাদের হাতে আসিল, মিথ্যাবাদী হইয়া তোমরা বলিলে কি না হাতে কিছু নাই। এ মিথ্যা কথায় কেবল তোমাদের নহে ইহাতে তোমরা অন্যেরও সর্ব্বনাশ হইতে দেখিবে। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন হইতে সংস্থাপক ও তৎসঙ্গিগণ ব্রহ্মলীলাতে বিশেষরূপে সংযুক্ত। সাধারণ ভাবে সকলেই নিযুক্ত, কিন্তু সেই সাধারণ শ্রেণীর উপরে দেখিতে পাইবে বিশেষভাবে নিযুক্ত আছে, ব্রহ্মপ্রেরিত আছে। এই প্রেরিত এক জন নয়, দুই জন নয়, পাঁচ জন নয়, দশ জন নয়, অনেক। কত জন আমি বলিতে চাই না, সময় তাহা বলিবে।

ইঙ্গিতে জানিয়া বলিতেছি, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ঘোর কলিযুগে প্রত্যাদেশ হয় না অন্ধকারের ভিতরে আলোক দেখা যায় না, এ কথা থাকিবে না। জাগ্রৎ ঈশ্বরপ্রেম মনুষ্য মধ্যে বাস করিলে নিঃশ্বাসে তাহা জানা যায়। কার্য্য দর্শন করিলেই জানিতে পারা যায় ইহাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত কি না? ঈশ্বর প্রেরণ করেন, ইহা বলিয়া কি হইল? ঈশ্বর কাহাকে প্রেরণ না করেন? কীট পতঙ্গ চাষা রাজা কে না প্রেরিত? সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত সত্য, কিন্তু বিশেষরূপে প্রেরিত আছে। বর্ত্তমান বিধানে যাঁহারা বিশেষ সাধন করিবেন, তাঁহারা বিশেষ কীর্ত্তিস্বরূপ হইবেন। ঈশ্বরের জ্যোতির প্রদীপ সদৃশ ভারতের অন্ধকারের ভিতরে তাঁহারা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছেন সূর্য্য না হন, চন্দ্র না হন, তারা না হন, অন্ততঃ এক একটি দীপ হইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ পাইবেন। ইহাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের অন্তর্গত। এই যে তোমরা দুই শত পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছ, সত্যের জ্যোতির উপরে সকলের দৃষ্টি পড়ে ইহার উপায় করিতেছ, ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। পুনরায় বলিতেছি, তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত। কেন না তোমরা সাধন করিতেছ, সংসারের সাধক হইয়াছ, অসার কার্য্য ধন, বিত্ত, নীচ কামনা

পবিত্যাগ কবিয়া জীবন উৎসর্গ কবিয়াছ। কি কার্য্যে ? জগতের কার্য্যে ; সাধক বলিয়া পবিগণিত হইবার জন্য জীবন পবিত্র করিবার কার্য্যে, এক জন হইতে দশ জন, দশ জন হইতে দশ সহস্র, দশ সহস্র হইতে দশ লক্ষ জন হইবে, এই কার্য্যে, অর্থকামনা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের উৎসবে, ধ্যানে, সৎপ্রসঙ্গে, সচ্চিন্তায় আপন জীবন উন্নত করিবার কার্য্যে, পবিত্র স্থান, পুস্তক, নির্জ্জন চিন্তা হইতে জ্ঞানলাভ, পক্ষী বৃক্ষলতা পল্লব নদীস্রোত নির্ম্মল শীতল বায়ু হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার কার্য্যে। যাহারা এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারাই সাধক। পাপ, অধর্ম্ম, ভীরুতা, এখন পর্য্যন্ত থাকিলেও তথাপি সাধক। অমুক নগর বা পল্লীতে অমুক লোক সংসারে ডুবিয়াছিল, সংসার হইতে একটু উঠিয়াছে, সেই বিপদের ঘোর সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধন করিতেছে, বাঁচিবার উপায় পাঠ কবিতেছে, ইহা ঈশ্বরের কীর্ত্তি, ঈশ্বরের লীলা। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের লীলা, আর সকলি ভ্রম।

অমুক স্থানে অমুক লোক ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সংসারে বদ্ধ ছিল, রাশি রাশি ধন পবিবর্জ্জন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ঈশ্বরের হস্ত হইতে বিশেষ উপায় বিশেষ সাধন লাভ কবিতেছে। এ সকল ব্রহ্মলীলা। যে সকল লোকের দ্বারা এই ব্রহ্মলীলা সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহারা সামান্য নন। তাঁহারা ঈশ্বর লীলার সাক্ষী। ব্রহ্মলীলা যেখানে যেরূপ হইতেছে একত্রিত কবিয়া ঈশ্বরপ্রেরিতগণকে গৌরব দিতে হইবে। সে সমুদায় লোক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তাঁহারা বৃক্ষতলে বসিয়া সাধন করুন অথবা সংসারে বসিয়া ধর্ম্মসাধন করুন, যেখানে যে অবস্থাপন্ন কেন না হউন, ধনী হইয়া অট্টালিকায় থাকুন, বা দরিদ্র ভিখারী হইয়া বেড়ান, যে প্রকার অবস্থাপন্ন কেন যিনি হউন না, সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত, সমাদরের পাত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের জীবন দেখিয়া সাধক বলিব, মহাত্মা বলিব, সামান্য বলিয়া মনে করিব না যাহা তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন, জীবনে তাহা সত্য করিব, হৃদয়ে তাহা আলোচনা করিব। এই সকল লোককে ডাকিয়া বলিব, তোমরা সাধক ঈশ্বরের

প্রেরিত। তাঁহারা স্বীকার না করিলেও সাধু বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিব। কে ব্রহ্ম প্রেরিত? উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম কি কাহাকেও প্রেরণ করেন না? এক সময়ে তিনি করিতেন, এখন তিনি করেন না, যাহা কিছু হইতেছে নিয়মানুসারে হইতেছে, এ কথা বলিলে কি করা যায়? এ বিবাদ নিষ্পত্তি কঠিন। শীঘ্র যদি অন্যূন পঞ্চাশ জন অন্য সমুদায় কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের আজ্ঞা প্রচার করেন, ব্রহ্মের দূত হইয়া আসিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞায় জগতের হিতসাধন করেন, সেই সকল লোককে অনাদর করিয়া কেন বলিব, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত নহেন? তাঁহারা সত্যের সমাচার গোপন করিবেন কি প্রকারে? যদি কোন সত্য শিক্ষা দিতে, কোন বেদশাস্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসিয়া থাকেন, তিনি বলুন না বলুন, আমি সেই লোককে প্রেরিত বলিব, নিশ্চয় বুঝিব তিনি সামান্য সাংসারিক লোক নহেন।

যিনি আমাদিগের মধ্যে অতিহীন, তিনিও যে ঈশ্বরপ্রেরিত ইহার প্রমাণ আছে। আমি এক জন কল্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঈশ্বর যে যে বিষয় আমার দ্বারা সাধন করিয়া লইয়াছেন, সে সকল বিষয় আমা হইতে হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার অবহেলা থাকিতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট তদ্বিষয়ে আমার উপেক্ষা নাই। আমার মন দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত সেই বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়াছে। বলুন, সাক্ষাৎ দেবতা ঈশ্বর হইতে এ সকল হইয়াছে, ঈশ্বরের বক্ষ হইতে মেদিনীতে আমি আসিয়াছি, অন্যথা আমি আসিতাম না। যাহা করিতে আসিয়াছি যদি তাহা না করি জন্ম বিফল। ব্রাহ্মেরা ইহাই সুসিদ্ধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান। তাঁহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি হইবে। কতক গুলি লোক সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উন্নতি বিস্তৃতি করিবেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের গন্ধ অল্প। এ ব্রাহ্মসমাজের আদর কি প্রকারে হইবে? হরিবিহীন ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজ হইবে কি প্রকারে? হরির হাত ধরিয়া উঠিবে হরির হাত ধরিয়া বসিবে, হরির কথা ঘোষণা করিবে। হরির আদেশ স্বীকার করাতে নিন্দা অপমান কি? হরির কথা স্বীকার করিতে নিন্দা অপমানের ভয়, লজ্জার বিষয়। ঈশ্বর সৃজন করিয়া

বলিয়া দিয়াছেন, বঙ্গদেশে আদেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করিবে। উপদেশ সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকেই উন্মত্ত করিতে হইবে, আদেশবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে, একথা বলিতে লজ্জা কি? বিশ বৎসর সাধন করিলে, এখনও বলিতে পার না সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছে, জীবন্মুক্তি হইয়াছে, বড় লজ্জার বিষয়। দশটি পরিবারের ভার লইয়া আজও ব্রাহ্মপরিবার সঙ্গঠনের চেষ্টা হইল না। যথার্থ কথা প্রচ্ছন্ন রাখিলে কি হইবে? লোকে খড়্গহস্ত হইবে বলিয়া কি সত্য বিলোপ করিতে হইবে? সত্য বলিতে লোকভয় কি? ভীরু হইয়া প্রকৃত সত্য সঙ্কোচ করিবে? সত্যপ্রকাশে লোকলজ্জার বিষয় কি? ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন একথা বলিলে লোকে উচ্চপদস্থ বলিবে এই তোমার বুদ্ধি? সত্য বলিলে অহঙ্কার প্রকাশ পাইবে, অসত্য বলিয়া বিনয়ী হইতে চাও? তুমি ব্রাহ্ম হইয়া নিজের বুদ্ধিমতে চলিতে চাও, ঈশ্বরের উপর কি তোমার সমুদায় ভার নহে? ঈশ্বর তোমাকে সত্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে তোমরা প্রত্যেকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাঁহার নিকটে ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রতী হইয়াছ, এ সকল পরিষ্কার কথা কিরূপে অস্বীকার করিবে? তোমরা কি ব্রহ্মের সঙ্গে বাদ করিবে? তোমরা যাহাই কর ব্রহ্মমন্দিরের বেদী তোমাদিগকে স্বীকার করিবে। যাও অন্ধকার নিবারণ করিয়া জ্যোতি বিস্তার কর। যাও ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তোমরা যে প্রেরিত প্রমাণ কর। মূর্খ বলিয়া ছল করিলে কি হইবে? যদি তোমরা হীনলোক বলিয়া স্বীকার কর, তথাপি ব্রহ্মমন্দিরের বেদী ঈশ্বরের প্রেরিত ভিন্ন আর কিছু বলিবে না। চন্দ্র সূর্য্য যদি বিলুপ্ত হয়, তথাপি তোমাদিগের এ পরিচয় জগতের নিকট থাকিবে। তোমরা সত্যের সাক্ষী, যতই তোমরা সত্যের সাক্ষ্য দান করিবে ততই তোমাদিগের দীপ্তি প্রকাশ পাইবে।

ব্রহ্মের প্রেরিত মানুষের সংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িবে। যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত তাঁহাদিগের এক কথায় সমুদায় অবিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহারা ব্রহ্মের নিকট কি কথা শুনিলেন, কি মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, কি কি নূতন সত্য অঙ্গীকার করিলেন, কি কি নূতন রত্ন লাভ করিলেন, এক-

বার জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে বেদ পুরাণ যেমন ব্রহ্মপ্রেরিত লোকদিগের জীবন তেমনি। হরির তত্ত্ব যাঁহারা শুনিতে পান তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। জীবনে যাঁহারা জাগ্রৎ সত্য দর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্মলীলা যাঁহাদিগের জীবনে চলিতেছে, সেই সকল সাধককে ডাকিয়া এক স্থানে করিলে মহদ্ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে। সকল সাধক একত্র হইয়া হরিতত্ত্ব কথা বলিবেন, ইহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। হরিনামের তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার যশোগান করিব, তাঁহার সুমধুর নামের পরিচয় দিব, তাঁহার নামে চমৎকৃত হইব, বিস্মিত হইব, হরিকথায় প্রমত্ত হইব, এ এক নূতন দৃশ্য। যাঁহারা যেখানে আছেন সকলে মিলিত হইয়া জীবনের কার্য্য আরম্ভ করুন, সকলে দলবদ্ধ হউন, তাঁহাদিগের মুখে হরিকথা শুনিয়া জীবন কৃতার্থ হউক।

ব্রহ্মাতেজ।

রবিবার ২২ ফাল্গুন ১৭৯৮ শক।

মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ এ কথা বলা ঠিক নহে। এ কথা যথার্থ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ইহা নীতি এবং সত্যবিরুদ্ধ। এই মতে অহঙ্কার আছে। ঈশ্বর একটি প্রকাণ্ড অগ্নির ন্যায়, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিলে, যে ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়, তাহা মনুষ্য আকারে জন্ম গ্রহণ করে। এই সমুদায় অগ্নিকিরণ একত্র করিলে আবার একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য হয়, এই মত ভ্রমাত্মক। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে মনুষ্যের আত্মাতে পরমাত্মার অগ্নি আছে। যে পরিমাণে সেই অগ্নির উজ্জ্বল দীপ্তি, সেই পরিমাণে মনুষ্যের গৌরব। মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ নহে, কিন্তু মনুষ্যের আত্মাতে ব্রহ্মাগ্নি নিহিত আছে। আত্মা তেজোময়, যখন আত্মা সেই তেজোবিহীন হয় তখন আত্মার মৃত্যু হয়। সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখ প্রাণের মধ্যে সেই ব্রহ্মাগ্নি আছে কি না। এই ব্রহ্মাগ্নি এই তেজ এই উদ্যমই আত্মার সর্ব্বস্ব। পাপবিনাশের ক্ষমতা এই তেজ। উপাসনা সাধনাদি দ্বারা এই তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজ বৃদ্ধির অর্থ পুণ্য প্রেম বৃদ্ধি। মনকে তেজেতে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত। তেজের হ্রাস হইবার

একটি কারণ বয়োবৃদ্ধি। যত বয়স বাড়ে, তত সেই তেজ ম্লান হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যেমন শরীর শীতল হইয়া আসে, তেমনি আত্মাও শীতল হয়, ইহা ভয়ানক কথা। ইহা যদি সত্য কথা হয় তবে ধর্ম্ম যে উন্নতিশীল ইহা আমরা মানিতে পারি না। যে মত আত্মার উন্নতি এবং পরলোক অস্বীকার করে তাহা অবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। যাহারা বলে যুবা বিদ্যা, ধর্ম্ম, পুণ্যে তেজস্বী হইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধের তেজ কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, তাহারা অবিশ্বাসী হয়। যুবা যখন বার্দ্ধক্যের মুখে পড়িল, তখন তাহার সমুদায় গুণ নিস্তেজ হইল। যৌবনে যত ক্ষণ সেই তেজ থাকে, তত ক্ষণ পাপ আসিলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেই পাপকে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধকালে আর সেই তেজ থাকে না। যত ক্ষণ উপাসনা করিবার ক্ষমতা আছে, তত ক্ষণ ভয় নাই, তত ক্ষণ সমুদায় বিঘ্ন বিপদ দূর করিয়া দিতে পারি। কিন্তু যখন উপাসনা করিবার শক্তি হ্রাস হইল, তখন আত্মা বলবীর্য্যবিহীন হইয়া পড়িল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে উপাসনার তেজ হ্রাস হইবে ইহা যদি সত্য কথা হয়, ইহা ভয়ানক কথা। আজ আমরা সজীবভাবে উপাসনা করিয়া হাসিতেছি, উপাসনার তেজে বিপদকেও তাড়াইয়া দিতেছি, কিন্তু বার্দ্ধক্যের মত মানিলে এমন সময় আসিবে যখন আত্মা শিথিল, অলস, নিরুদ্যম এবং নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। ইহা মরিবার কথা, এ কথা ঠিক নহে। যথার্থ কথা এই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেজ হ্রাস হয় না, তেজ বৃদ্ধি হয়। যত উপাসনা গভীরতর হইবে, ক্রমাগত আত্মার মধ্যে সেই তেজ উজ্জ্বলতর হইবে। তপস্বীদিগের শরীরের চারি দিকে পবিত্র তেজ এবং স্বর্গীয় প্রভা নির্গত হইতেছে, শত্রুতা সেই জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয়, এই কথার ভিতরে আমরা এই সত্য গ্রহণ করিতে পারি, যত দিন তপস্যার বল আছে তত দিন কোন ভয় নাই। তপস্যার তেজ নির্ব্বাণ হইলেই বিপদ, তখন মনুষ্য এই প্রকার বিপদে পড়ে যে সে চেষ্টা করিলেও আর উঠিতে পারে না, তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকে না, সে কোন মতেই তাহার মনকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আনিতে পারে না, তাহার পাপগুলি আর দমন করিতে পারে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিব শরীরের বার্দ্ধক্য আসিলে আত্মার তেজ, আত্মার তপস্যার বল কমে না, তবে দৃঢ় বিশ্বাসীর

তেজ হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাসী এবং নিত্য সাধন করেন, তাঁহারা মৃত্যু শয্যাতে আরও উজ্জ্বলতর দীপ্তি প্রকাশ করিতে থাকেন, তাঁহাদের ব্রহ্মতেজ যায় নাই। যে বস্তু অনন্তকালের ব্যাপার তাহার উপরে কালের মৃত্যুর আধিপত্য নাই। দেহের সঙ্গে আত্মাও দুর্ব্বল হয় ইহা মিথ্যা কথা। বৃদ্ধকালে ক্ষত্রিব অর্থাৎ দৈহিক বল ক্ষয় হয়, কিন্তু আত্মার তেজ বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মবলের তেজ যেখানে সেখানে কালের কোন ক্ষমতা নাই। ব্রহ্মতেজে যিনি তেজস্বী যিনি মৃত্যুশয্যায় বলেন, শমন আমি তোমার ধার ধারি না, আমার উপরে তোমার কোন অধিকার নাই। মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর আমার মন্ত্রদাতা, দীক্ষাদাতা গুরু, মৃত্যু, তুমি আমার কি করিবে? আমি তোমার দ্বারা কখনই পরাস্ত হইব না। অতএব যে বল, যে ব্রহ্মতেজ সাধন দ্বারা বৃদ্ধি হয় তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়। শরীর ক্ষয় হউক না কেন, শরীর যখন নষ্ট হয় তখনই ত আত্মা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। পিঞ্জর ছাড়িয়া যখন পাখী উড়ে তখনই ত তার ডানার অধিক বল প্রকাশিত হয়। অবিশ্বাসীরাই কেবল এই কথা বলে—আগে আমাদের উপাসনা ধ্যান যত দ্রুতবেগে চলিত এখন আর তেমন হয় না, এখন অধিক বয়স হইয়াছে এখন অধিকক্ষণ ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে কষ্ট হয়। বিশ্বাসী বলেন যত বয়স বৃদ্ধি হইতেছে তত ঈশ্বরের সঙ্গে গাঢ়তর ঘনিষ্ঠতর যোগ হইতেছে। যৌবনকালে আধ ঘণ্টা কঠোর সাধন করিলে ঈশ্বরের দর্শন পাইতাম, এখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার দর্শন লাভ করি। বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া যৌবনকালের সাধক লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। শরীর শীর্ণ হইল বলিয়া কি নিরপরাধী আত্মা উপাসনা করিতে পারিবে না? শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি নিরপরাধী আত্মাকে ঈশ্বর বধ করিবেন? শরীরের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে বলিয়া কি আত্মার চক্ষে ভক্তি প্রেমের অশ্রু পড়িবে না যদি তুমি ভক্ত হও, তোমার শরীর যত শীর্ণ হইবে তোমার আত্মা তত অধিক তেজ ধারণ করিবে। বৃদ্ধের উৎসাহ দেখিয়া যুবারা উৎসাহী হইবে। স্বর্গীয় উৎসাহের কথা আর কি বলিব? স্বর্গের উৎসাহ বৃদ্ধকালে আরও অধিকতর তেজ লাভ করে। যত উপাসনা করিবে উপাসনা তত সতেজ এবং সরস হইবে। উপাসনাই উৎসাহের আকর। এই

উপাসনা দ্বারা আমাদের আত্মা স্বর্গলোক, পরলোকের জন্য উপযুক্ত হউক।

ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক।

রবিবার ২২ শ্রাবণ, ১৮০১ শক।

রোগপ্রতীকারের জন্য চিকিৎসা করা ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। এক রোগীর সেবা করিবার জন্য কত নিগূঢ় বিষয় জানিতে হয়, কত উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, কত পরিশ্রম ও পুস্তক পাঠ করিতে হয়। এত পরিশ্রম, এত যত্ন, এত বিদ্যা বুদ্ধি, এ সকলের শেষ ফল কি হইল,—রোগের প্রতীকার, রোগীর আরোগ্য। আরোগ্য শব্দের অর্থ কি? রোগ হইতে মুক্তি। রোগ হইতে মুক্তি আরোগ্য, ইহার সহজ ভাষা, শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন, যে বিকৃতি হইয়াছিল তাহা ঘুচাইয়া প্রকৃতিকে পুনঃপ্রকাশ। আরোগ্যে অস্বাভাবিক স্বাভাবিক হইল। এত যত্ন পরিশ্রমের ফল হইল শরীরের স্বভাব। শরীরের যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহাই হইল। এ দিকে আত্মা সম্বন্ধেও অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকা পাপ, মোহ, অবিশ্বাস আসক্তি, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা উন্নতি, ধর্ম্ম, শান্তি। চিত্তবিকারের নাম নরক, প্রকৃতিতে অবস্থিতির নাম স্বর্গ।

ধর্ম্মসাধন প্রণালীর অর্থ কি, অভিপ্রায় কি? বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ করা। পৃথিবীর যত লোক অস্বাভাবিক বিকারের পথে ভ্রমণ করিতেছে, প্রকৃতি ঘুচাইয়া বিকৃতি আনয়ন করিয়াছে, বিকারের ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে উপাসনা যোগ ধ্যান সাধুসঙ্গ প্রভৃতি তাহাদিগকে সেই বিকৃতি হইতে প্রকৃতির পথে আনয়ন করিবার জন্য। ধর্ম্মের দ্বারা কি হয়? মনুষ্যেরা সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে আগমন করে। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করি। এখানে কঠোর ভাষা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম স্বাভাবিক না হইলে রোগ, ধর্ম্ম স্বাভাবিক হইলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সহজ হইল। ঈশ্বরদর্শন শক্ত; আদেশশ্রবণ শক্ত লোকে মনে করে, ফলে

শক্ত নহে। দর্শন শ্রবণ স্বাভাবিক। কাণা ও বধির দেখিতে শুনিতে পায় না, কিন্তু তদ্ভিন্ন কে দর্শন শ্রবণ করিতে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে? শিশু যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সহজে দেখে সহজে শুনে। দেখা শুনা ভয়ানক ব্যাপার নহে। বল, কে দেখা শুনা সহজে সম্পন্ন করিতে পারে না? শরীর এমনি গঠিত, মনুষ্য চক্ষু খুলে আর অমনি দেখিতে পায়। অন্ধ হইলে লোকে দয়া করে, চক্ষু আছে বলিয়া কেহ প্রশংসা করে না। দর্শন জন্য গৌরব দেয় কে? চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য দেখে তাহাতে তাহার পুরস্কার কি, গৌরব কি? চক্ষুর যেমন সেখানে গৌরব নাই, তেমনি শব্দ শুনিতেও কর্ণের গৌরব নাই। কর্ণের শব্দ শ্রবণ প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা স্বাভাবিক সহজ, কে তাহাতে গৌরব দিতে চায়? শরীরসম্বন্ধে দর্শন শ্রবণ যেমন সহজ, আত্মসম্বন্ধে তদ্রূপ হওয়া উচিত। শারীরিক চক্ষু যদি দেখিতে না পায়, যাহাতে দেখিতে পাই তজ্জন্য চিকিৎসকের শরণাগত হই। চিকিৎসাপ্রণালী আর কিছু নহে চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করা। অনেক ঔষধ অনেক পরিশ্রম, শেষে এই ফল হয় যে রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন। বিকার ঘুচিয়া গেলে চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরায় দেখিতে পায়। আত্মা ব্রহ্ম দর্শন করিবে তাহাতে কঠোর উপায় অবলম্বন শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির কি প্রয়োজন? আর কিছুর প্রয়োজন নাই কেবল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা চাই। আত্মাকে স্বাভাবিক পথে আন, দেখিবে সকলি সিদ্ধ হইবে। চেষ্টা কর, আয়োজন কর, অধ্যবসায় নিয়োগ কর, সাধন কর, কিন্তু এসকল স্বাভাবিক প্রণালীতে নিযুক্ত কর।

হে ব্রাহ্ম কল্পিত পথে যাইও না। স্বাভাবিক সহজ প্রণালী অবলম্বন কর, চক্ষু খুলিলে আর তৎক্ষণাৎ দেখিবে। নিমিষ মধ্যে ব্রহ্মদর্শন না হইল তো হইল না। হৃদয় বিকারগ্রস্ত, যদি ব্রহ্মের গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিতে না পাও, নূতনবিধ শাস্ত্র বুঝিতে না পার। সহস্র উপদেশ শুনিয়া তোমার কি হইবে তোমার শ্রবণশক্তি এখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই। তোমার কর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে কত উপদেশ শুনিতে পাইবে। ঈশ্বরের বাণী নিয়ত আসিতেছে, নিয়ত তিনি আদেশ করিতেছেন, প্রাতঃকাল সায়ংকাল গভীর নিশীথ কোন সময়ে তিনি কি বলিবেন কে জানে?

যাহাতে পরব্রহ্মের আদেশ ও উপদেশ সহজে বুঝিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমাদিগের ধর্ম্ম অস্বাভাবিক হইতে পারে না। যে পথ অস্বাভাবিক, ব্রহ্ম কখন সে পথে যান না। শরীর যদি শীতল বায়ু চায়, তাহা স্বাভাবিক প্রণালীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রেমের শীতল বায়ু লাভ করাও আত্মার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। সমুদায় অভাব গুলির পূরণ স্বাভাবিক প্রণালীতে হইবে, ইহাতে বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম আড়ম্বরশূন্য। ইহার সাধন সহজ, যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলই সহজ। বহুকষ্টে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয় না।

আমাদিগের মধ্যে এখনও ধর্ম্ম ঔষধ সেবনের ন্যায় হইয়া আছে। ফলতঃ এখনও আমাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। কঠিন উপধর্ম্ম এখনও রহিয়া গিয়াছে, যে বস্তু আমরা চাই এখনও তাহা প্রাপ্ত হই নাই। যথার্থ বস্তু না হইলে ধর্ম্মসাধন কঠিন থাকিবেই। নিরবলম্ব উপায়ে ধ্যান করিতে হইবে। এখনও ধ্যান অত্যন্ত কঠোর হইয়া আছে। একপে কখন ধ্যান অভ্যাস হইবে না, ধ্যান করিতে গিয়া সংসারের চিন্তা দূর করিতে পারিবে না। যথার্থ ধ্যান করিতে অনেক সময় লাগে, ঈশ্বরে চিত্তসমাধান বহু আয়াসসাধ্য, সহজে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করিয়া যোগ করিতে হয়, যথার্থ ব্রহ্মযোগী এরূপ কখন বলেন না। যথার্থ যোগী যখন যোগ সাধন করিতে থাকেন, তখন তিনি পৃথিবী হইতে দশ হাত ঊর্দ্ধে উঠেন। মন্দিরে আমরা একত্র হইয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলি, কিন্তু এক "সত্যং" উচ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যোগীর আত্মা ১০০ ক্রোশ উপরে চলিয়া যায়। তুমি যদি বল বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় সাধন করিতে হইবে, তবে যোগে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা যায়, এ কথা ঠিক নয়। এ কথা অন্যান্য ধর্ম্মে সাজে। বহু আড়ম্বর বহু উপায় বহু সাধন বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ফল কেবল কষ্ট। ব্রহ্মকে এরূপে লাভ করা যায় না, সুতরাং এরূপ পথ অবলম্বন অসঙ্গত। জলে নামিলেই যেমন তাহাতে মগ্ন হওয়া যায়, পক্ষী যেমন অনায়াসে উপরে উঠে, আত্মার ব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়া, মানসপক্ষীর ঊর্দ্ধে উঠা তেমনি সহজ। উড়িতে ডুবিতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। স্বভাবের

ধর্ম্ম স্বীকার করিলে, অনায়াসে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে কিছু অস্বাভাবিক নাই। যোগ ব্রহ্মদর্শন সহজ, অন্যথা ভুবৎসর চিন্তা করিয়াও কেহ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে না। কঠোর চেষ্টাতে স্বভাবকে ছাড়িয়া যাওয়া হয়। কষ্টে সাধন, প্রকৃতির ফল নয়। সে ফল প্রকৃত ফল নয়, সে প্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী নয়। অন্য ধর্ম্মে এ সকল অস্বাভাবিক প্রণালী অনুসরণ শোভা পায়, কিন্তু এই মন্দিরে যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদিগের নিকট দর্শন, বস্তস্পর্শ, প্রার্থনা এবং তাহার সদুত্তর শ্রবণ যদি সঙ্গে সঙ্গে না হয়, তবে সংশয় হয় এ সকল প্রকৃত নহে কল্পনা, কেবল টানিয়া মন হইতে বাহির করা। প্রকৃতিস্থ থাকিলে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ হয়। সর্ব্বদা সাবধান হও, অস্বাভাবিক বস্তুর জন্য কখনও প্রয়াস করিও না। স্বভাবতঃ ব্রহ্মকে দর্শন কর, সমুদায় বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সহজ পথে আসিতেছ কি না দেখ। শরীরকে প্রকৃতিস্থ কর, মনের পাপ, কুসংস্কার, মিথ্যা চিন্তা দ্বারা মন চঞ্চল না হয় এ জন্য স্বভাব দ্বারা পাপকে জয় কর, দেখিবে অতি সহজে যোগী হইবে। এক মিনিট বসিয়া দেখ দর্শন হয় কি না? এক মিনিটে দর্শন হইলতো হইল, নতুবা দুই পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়াও বিকার না ঘুচিলে কিছু হইবে না। স্বভাবতঃ অঙ্গস্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারা-যায় অঙ্গ প্রকৃতিস্থ কি না? হৃদয় প্রকৃতিস্থ কি না, স্বভাবের নিকটে তাহার মীমাংসা।

অনেক চিন্তা অনেক ক্রন্দন ইহাতে কিছু হয় না যদি অর্দ্ধ ঘণ্টা সরল প্রার্থনা হয়, চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ হইল, ফল তৎক্ষণাৎ হইবে। ব্রহ্মদর্শন যখন হয়, তখন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হয়, অন্যথা অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর আছেন, এই বক্ষে আছেন, প্রেরিত মহাজনগণকে রক্তের ভিতরে দেখিতেছি, এরূপ সহজাবস্থা ভিন্ন সুখ হয় না। বহু আয়াস চেষ্টাতে শান্তি হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্ম আড়ম্বরশূন্য। স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে থাক, যাহা কঠোর তাহার অন্বেষণ করিও না। পিতার প্রতি সন্তানের সন্তানের প্রতি পিতার ভাল বাসা সহজ, অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া আর তাহা আয়ত্ত করিতে হয় না। কর্ণ পাতিয়া শুন ঈশ্বর কি বলিতেছেন।

এ কথায় যে ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া অস্বীকার করিল, তাহার কর্ণ আছে কে বলিতে পারে? যদি কর্ণ থাকে, যেমন শুনিবে অমনি নিশ্চিত বিশ্বাসের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে। চক্ষুকে স্বাভাবিক কর, দেখিবে কেমন তাঁহাকে বাহ্য বস্তুর ন্যায় দেখা যায়। ব্রাহ্মের চক্ষু আছে শ্রবণ আছে, অথচ সে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, তাহার সমুদায় বৃত্তি স্বাভাবিক আছে অথচ ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে পারে না, ইহা হইতে পারে না। তাহার সমুদায় বৃত্তি বিকৃত হইয়াছে, চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু বিকৃত প্রণালীতে চিকিৎসা করিও না। প্রকৃতিস্থ করিতে শুভ ক্ষণের প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এমন দিন হইবে, যে দিন জল পান করার ন্যায় ভাত খাওয়ার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান সহজ হইবে। কখন সহজ ভাব ছাড়িব না। যদি সহজে শুনিতে না পাই, চিকিৎসার অধীন হইব, কিন্তু যোগধ্যান কঠিন বলিব না। ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধন করিয়া ধ্যান করিবে ইহা কঠিন, ইহাকে বিফল যোগ বলি। প্রকৃত ধ্যান তাহাকে বলি, যাই চক্ষু বন্ধ অমনি প্রাণ উর্দ্ধে উড়িয়া গেল। যদি তোমাকে কতক ক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়, সংসারে চলিয়া যাও, তোমার ধ্যান হইল না। চেষ্টা কি জানি না। জলে নামিলাম আর ডুবিলাম। চেষ্টা করিব, যোগ করিব, প্রেম সঞ্চয় করিব, ইহা হয় না। চেষ্টা করা পাপ, কঠোর যোগসাধন অপরাধ। সেই ব্রাহ্ম মূর্খ যে চেষ্টা করে, সেই ব্রাহ্ম অপরাধী যে কঠোর সাধন করে। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাঁচ মিনিট চেষ্টা করিতে হয়, তখন সংশয় হইবে হৃদয় বিকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মযোগী বিলম্ব করেন না, পরিশ্রম করেন না, যোগানন্দসম্ভোগ তাঁহার নিকটে জল পান করার ন্যায় সহজ। যেমন তিনি বসিলেন তৎক্ষণাৎ যোগ হইল, তাঁহাকে কষ্ট করিতে হইল না, চেষ্টা করিতে হইল না। সন্তরণ শিখিতে চাও, গা ছাড়িয়া দাও, সহজ অবস্থায় সন্তরণ শিখিতে পারিবে। যদি সন্তরণে আয়াস প্রকাশ করিয়া জলে আঘাত কর, সন্তরণ করিতে পারিবে না, জলমগ্ন হইয়া যাইবে। যদি যোগী হইতে চাও আপনাকে সহজাবস্থায় ছাড়িয়া দাও, টানাটানি করিয়া করিলে কিছু হইবে না। সহজাবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া দিলে ফল লাভ হইবে, ব্রহ্ম তোমার বক্ষে সহজে তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিবেন। হে মনুষ্য, আধ্যাত্মিক অবস্থা সহজ এবং স্বাভা-

বিক। শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রকাণ্ড যোগের ব্যাপারও সহজ। সহজ অবস্থায় থাকিয়া সহজ উপায় অবলম্বন কর, সমুদায় বিকৃত পরিশ্রম দূর করিয়া দাও। জলে নামিলে যেমন সহজে ডোবা যায়, তেমনি এক্ষেতে ডুবিতে পারিবে, পক্ষীর ন্যায় সহজে উর্দ্ধে উড়িয়া যাইবে। সহজ পথে চল, স্বভাবের উপর নির্ভর কর, ঈশ্বর তোমাকে আশ্চর্য্য সুধাপান করাইবেন।

দর্শন ও নিরীক্ষণ।

রবিবরার, ২৯ ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক।

ব্রহ্ম পুষ্পের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ভক্তের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হন। যদিও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ তথাপি তিনি ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়া উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া সাধকের আত্মাতে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের মনের গুপ্ত ভাবসকল ক্রমে ক্রমে ভক্তের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রথমে যে ঈশ্বরের অল্প প্রকাশ হয়, তাহার প্রতিই সাহস পূর্ব্বক দৃষ্টিকে স্থির রাখিতে হইবে। অনেকে অস্থির হইয়া ভীত হন। তাঁহারা বলেন, নিরাকারের প্রতি কিরূপে অধিক ক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিব? কিন্তু ধৈর্য্যশীল হইয়া নিরাকাররূপ একটি ক্ষুদ্র মূল ধরিয়া থাক, ক্রমে ক্রমে সেই মূল হইতে অনেক প্রকার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। একটি গোলাপ ফুল যখন কেবল ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার সমুদায় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা অতীব সুন্দর হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম-পুষ্প ক্রমে ক্রমে তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হইব। ভক্তির পরিমাণ অনুসারে সাধকের হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা প্রভৃতি অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। যত মনুষ্যের প্রাণকে অন্য বস্তু টানিয়া লয়, তত তাহা চঞ্চল হয় এবং তত তাহা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। আর সাধক অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যত ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখেন, তত তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তিনি

ক্রমাগত ঈশ্বরের নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। বিষয়াসক্ত মন ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না। শুষ্ক অভক্ত চক্ষের নিকটে ব্রহ্ম অপ্রকাশিত থাকেন। অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন, দৃষ্টি স্থির করার অর্থ ঈশ্বরকে ধারণ করা। নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরকে ধারণ করা চঞ্চল মনের কার্য্য নহে। চক্ষু, আর কিছুই দেখিও না, কেবল এইখানে ব্রহ্ম আছেন তাঁহাকেই দেখ, চক্ষু যদি অভক্ত হয় সে বলিবে আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কোথায় ব্রহ্ম, কেবলই শূন্য দেখিতেছি। অভক্ত চক্ষুকে যদি আরও স্থির করিতে চেষ্টা কর, সে আরও ভয়ানক হৃদয়বিদারক কথা বলিবে। সে বলিবে, আগে যেন নিকটে একটি হৃদয়বন্ধু আছেন বোধ হইত, এখন দেখিতেছি কেহই নাই। এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে কি করা উচিত? সে বলিবে যখন দৃষ্টি স্থির করিলে কিছুই দেখিতে পাই না, তখন অত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল উদ্দেশে তাঁহাকে ডাকাই ভাল। খুব সূক্ষ্মরূপে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলে যখন তিনি একেবারে দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হন, তখন ভিতরে বাহিরে সমুদ্রে পর্ব্বতে ফলে ফুলে সর্ব্বত্র তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা না করিয়া দিনান্তে নিশান্তে এক আধ বার প্রাণের সহিত তাঁহাকে ডাকাই ভাল। এই যুক্তির মধ্যে যে কেবল অসত্য আছে তাহা নহে ইহার মধ্যে ঘোর বিপদ্ স্থিতি করিতেছে। ফলতঃ শুষ্ক নয়নে যেখানে সেখানে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে আশা করিলে নাস্তিকতার হস্তে পড়িতে হয়। আগে দৃষ্টিকে প্রেমভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া লও, পরে সেই প্রেমার্দ্র চক্ষু যখনই ব্রহ্মের উপরে পড়িবে, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মরূপসাগরে মগ্ন হইয়া যাইবে। ভক্ত চক্ষু একেবারে ব্রহ্মের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যায়। যখন এইরূপে চুয়ের যোগ হইবে তখন যতই ব্রহ্মদর্শন করিতে ইচ্ছা কর ভয় নাই। কেন না তখন তোমার সরস ভক্ত নয়ন প্রেম রজ্জুদ্বারা ব্রহ্মকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। যখন ব্রহ্ম তোমার চক্ষুর সঙ্গে গ্রথিত হইলেন, তখন তোমার চক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকে যাইতেই হইবে। তখন ব্রহ্ম তোমার নয়ন-অঞ্জন হইলেন। এই অবস্থার পূর্ব্বে ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিলে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়, তখন কেবল দুই এক বার পথের দেব-

তার ন্যায় ব্রহ্মকে দর্শন এবং নমস্কার করিয়া যাওয়াই ভাল। প্রথমাবস্থায় নিরীক্ষণ করা বিপদের কারণ। প্রথমে হে ঈশ্বর, তুমি আছ, এই কথা বলা যায়, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি কেমন, এ প্রশ্ন করিয়া ঈশ্বরের রূপ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করা বিপদের বিষয়। মধুকর যেমন প্রথমে অল্প অল্প পুষ্পমধু পান করে, পরে ক্রমশঃ পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুধা পান করিয়া মত্ত হইয়া যায়, ভক্ত সাধকও সেইরূপ প্রথমাবস্থায় বারংবার ঈশ্বরকে দর্শন করেন, কিন্তু উন্নত অবস্থায় ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ না করিলে তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। যত ক্ষণ না কোন বস্তু স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তত ক্ষণ তাহার গুপ্ত মনোহর ভাব গণনা করা যায় না। কোন একটি সুন্দর ছবি প্রথমে আমরা দর্শন করি, পরে নিরীক্ষণ করি, তার পরে সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করি। বন্ধুকে ঘরে পাইলে প্রথমে তাঁহার মুখ অবলোকন, পরে যতই প্রেমচক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করি, ততই চক্ষু বন্ধুর রূপরসে ডুবিয়া যায়। সেইরূপ, হে উন্নত ব্রাহ্ম, যত ঈশ্বরেতে দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছ, ততই ঈশ্বরকে মনোহর দেখিয়াছ কি না বল? আকাশের মধ্যে শুষ্ক নয়নে তাকাইলে কেবলই শূন্য, এবং ধূ ধূ দর্শন করিবে, আর যদি ভক্তিনয়নে দেখ ব্রহ্মকে নিকটে দেখিতে পাইবে, এবং দেখিবে সেই এক জন ক্রমাগত নূতন নূতন বেশ ধরিতেছেন, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সেইরূপ দেখিতে দেখিতে ভক্তনয়ন অবশেষে একেবারে ব্রহ্মরূপসাগরে ডুবিয়া যাইবে। অতএব তখন নয়নকে ঈশ্বরের প্রতি স্থির করিবে যখন নয়ন সজল হইবে। তখন যত দেখ তত লাভ, তখন আর ভয় নাই। তখন নির্ভয়ে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিবে, কারণ তখন নাস্তিকতা বিপদের আশঙ্কা চলিয়া গিয়াছে।

ভাগবতী তনু।

রবিবার ২৪ ফাল্গুন ১৮০২ শক।

আত্মার আধার শরীর। শরীরের আধার আত্মা। শরীরের ভিতরে আত্মা থাকে, আবার আত্মা বিনা শরীর জীবিত থাকিতে পারে না।

আত্মাকে অবলম্বন করিয়া শরীর বাঁচিয়া আছে, আত্মা না থাকিলে মৃত শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না। আবার শরীর বিনা আত্মা পৃথিবীতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং শরীর যেমন আত্মার আধার আত্মাও তেমনি শরীরের অবলম্বন। দুই কথাই সত্য। আমরা মনে করি আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে, কিন্তু শরীরের সাহায্যে যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, পুণ্যরস, ও শান্তিরস লাভ করে তাহা সর্ব্বদা ভাবিয়া দেখি না। জীবাত্মা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম মধু, জ্ঞানমধু প্রভৃতি নানা প্রকার সুমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্চয় করে, অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও আমরা জড়বাদীর ন্যায় এই অসার অস্থায়ী শরীরকে সর্ব্বস্ব মনে করি না, তথাপি প্রত্যেক ব্রাহ্মকে মানিতে হইবে যে এই অনিত্য শরীর আত্মার নিত্যধর্ম্ম,নিত্যজ্ঞান এবং নিত্যসুখ উপার্জ্জনের বিশেষ সহায়। জীবাত্মা ধরাধামে এই অসার শরীরের দ্বারা অনন্তকালের জন্য প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করে। কিন্তু এক দিকে যেমন আমাদের এই তনু আত্মার জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির প্রধান সহায, আর এক দিকে আবার তেমনি আত্মার অধোগতি ও সর্ব্বনাশের কারণ। একদিকে যেমন এই দেহ নানা প্রকার ধর্ম্ম ও বিপুল আনন্দের কারণ, অন্যদিকে ইহা আবার নানাবিধ অধর্ম্ম ও অশেষ যন্ত্রণার হেতু। আমরা এই শরীর দ্বারা যেমন পুণ্য ও শান্তি সঞ্চয় করিতে পারি তেমনি ইহা দ্বারা আবার নানা প্রকার পাপ ও দুঃখ সঞ্চয় করিতে পারি। মানুষ, তোমার কাম, ক্রোধাদি পাপের আধার কোথায়? তোমার শরীরের ভিতরে। যত দিন পর্য্যন্ত না তোমার তনু ভাগবতী তনু হইবে, তত দিন ইহা পশুতনু, তত দিন ইহা ষড়রিপুর তনু, দুর্দ্দান্ত দৈত্যদিগের বাসগৃহ। হয় তনু ভগবানের এবং ভক্তদিগের বাসস্থান হইবে, নতুবা ইহা অসুরদিগের আলয় থাকিবে। হে মানুষ, যদি তুমি তোমার শরীরের মধ্যে ভগবান্ ও তাঁহার সাধুদিগকে প্রতিষ্ঠিত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অসুরেরা আসিয়া তোমার শরীর অধিকার করিবে। তোমার দুই চক্ষু দুই ভয়ঙ্কর অসুরের বাসস্থান হইবে, তোমার দুই কর্ণ দুই দৈত্যের গর্ত্ত হইবে, তোমার

রসনা কালসর্পের আধার হইয়া চারি দিকে নরনারীর কর্ণে পাপ গরল ঢালিয়া দিবে, তোমার প্রত্যেক হস্তের পাঁচ অঙ্গুলীতে পাঁচ কাল দৈত্য আসিয়া বসিবে। তোমার সমস্ত শরীর পাপের আলয় হইয়া উঠিবে। তোমার শরীরের কোন অংশ, কোন যন্ত্র শুদ্ধ থাকিতে পারিবে না। শরীরকে যদি আপন বশে না রাখিতে পার তবে কেবল মন শাসন করিয়া কি হইবে? শরীর যদি পাপের উত্তেজক না হয় কেবল মনের মধ্যে কি দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে? পাপের ইচ্ছা চরিতার্থ হয় কিসে। এই অপবিত্র দেহে। এই শরীর দেখিতে অতি সুন্দর এবং নির্দ্দোষ মনে হয়, কিন্তু ইহার ভিতরে যখন পাপাসুরেরা আসিয়া বাস করে, তখন ইহা অত্যন্ত বিকৃত ও ভয়ঙ্কর হয়। যখন সয়তান আসিয়া চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ এই আটখানি যন্ত্র অধিকার করে, তখন এক শরীর নিতান্ত দুর্গন্ধ নরক হইয়া উঠে। যদি তোমার তনু অসুরের তনু হয় তবে বাহিরে একটু সামান্য প্রলোভন দেখিলেই তোমার শরীরের ভিতরে কুবাসনার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। শরীরের কোন স্থানে পাপ লুকাইয়া থাকে তাহা নহে। আমার চক্ষে অমুক পাপ, আমার মস্তিষ্কে অমুক পাপ, অথবা আমার হস্তে অমুক পাপ, এরূপে কেহ পাপ ধরিতে পারে না। শরীরের অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুকেও তুমি ধরিতে পার, কিন্তু অতি স্থূল পাপকেও তুমি ধরিতে পার না। যত দিন না ভাগবতী তনু লাভ করিতে পার তত দিন তোমার তনু পাপে পূর্ণ থাকিবে, কিন্তু সে পাপকে তুমি দেখিতে পাইবে না। এক আসুরিক তনু, আর এক ভাগবতী তনু। এই দুইয়েতে অনেক প্রভেদ। আসুরিক তনু ষড়রিপুর অধীন, ভাগবতী তনু রিপুর অতীত, কেবল ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তদিগের লীলাবিহারক্ষেত্র। পশুতনুতে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা এ সমস্ত রিপু উত্তেজিত হয়। বাহিরে কাম্য বস্তু দেখিলেই পশু তনুর ভিতরে কামনার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বাহিরে রাগের কারণ দেখিলেই পশুতনু ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হয়, বাহিরে টাকা প্রভৃতি লোভের সামগ্রী দেখিলেই পশুতনু সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হয় এবং লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য নির্দ্দোষ বালকের মুণ্ড ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হয়

না, অপরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে পশুতন্থতে ঈর্য্যানল প্রজ্বলিত হয়। এইরূপে অজিতেন্দ্রিয় আসুরিক তনু সর্ব্বদাই নানাপ্রকার নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। ভাগবতী তনু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাগবতী তনু যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মন প্রশান্ত, তিনি সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার শরীর অতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। উহা দেবতাদিগের বাসস্থান। তাঁহার শরীরমন্দিরের মধ্যে কোন পাপাসুর আসিতে সাহস করে না। তাঁহার শরীর পুণ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ। সয়তান সে দিকে যাইতে পারে না। যে ব্রহ্মচারী যুবা ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন, নিত্যোপাসনা তাঁহার প্রাণের সম্বল, তাঁহার অন্তরে নিরন্তর বৈরাগ্যানল জ্বলিতেছে। কোন প্রকার পাপাসক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মচারী বৈরাগীর ভাগবতী তনু দর্শন করিয়া ষড়রিপু পরস্পরকে বলে,—"ভাই এই ব্যক্তি বজ্রদেহী, ইহাকে স্পর্শ করি আমাদের এমত সাধ্য নাই, ইহার অস্থির ভিতরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম এবং তেজস্বী পুণ্যাত্মা সকল বাস করিতেছেন, এ শরীর আমাদিগের বাসের পক্ষে অনুকূল নহে। ইহার মস্তিষ্কে নিরন্তর সুমতি ও সচ্চিন্তার উদয় হয়। ইহাঁর হৃদয়ে ব্রহ্মপ্রেমের প্রবল স্রোত বহিতেছে। ইহাঁর রক্ত মাংস ও অস্থি মধ্যে সাধু বীরেরা হুঙ্কার করিতেছেন। এমন ভয়ানক স্থানে থাকা হইবে না। চল আমরা ইহাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি।" এইরূপে ভাগবতী তনুর তেজ দেখিয়া কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত আসুরিক ভাব ও পশুভাব পলায়ন করে। যে শরীর এইরূপে কুভাবশূন্য হয় সেই শরীর ঈশ্বরের আদেশে প্রকৃতির নিয়মানুসারে শীঘ্রই সাধুদিগের বাসস্থান হয়। প্রকৃতির এই নিয়ম যে কোন স্থান শূন্য থাকিবে না। যখনই কোন শরীর হইতে কাম ক্রোধাদি সমস্ত অসুর দল চলিয়া যায় এবং উহা শান্ত ও কামনাশূন্য হয়, তখনই সেই শরীর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা, মুষা, সক্রেটিস্, মহম্মদ, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সাধু মহাত্মগণ প্রবেশ করিয়া সেই শূন্য শরীরকে পূর্ণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পরস্পরকে বলেন "কেমন ভাই, আমরা ইহার শরীরের ভিতরে স্থান পাব তো?" শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশা ও শাক্য প্রভৃতি দেবাত্মাদিগকে বলিলেন "এই শরীর আমার অত্যন্ত

মনোনীত হইয়াছে। ইহার বক্ষ ও হৃদয় এমন প্রশস্ত, উহা ছাড়িয়া আমি আর কোথায় গিয়া নৃত্য করিব ?" মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "ভাই গৌরাঙ্গ, আমিও এই শরীরমন্দিরে বাস করিব, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া আসিবার সময় আমার বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা আমার রক্ত মাংস পান আহার করিলে আমি তোমাদিগের শরীরের মধ্যে বাস করিব। এই সাধু যুবা আত্মেচ্ছা বিনাশ করিয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, অতএব আমি ইহার শরীরের মধ্যে রক্ত মাংস রূপে বাস করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ, কেবল তুমিই ইহার শরীরের মধ্যে গিয়া বাস করিবে, আমি কি ইহার শরীরের মধ্যে যাইব না ?" যখনই শরীরের ভিতর হইতে অভক্তি ও স্বেচ্ছাচাররূপ দুই অসুর পলায়ন করিল, দুই দুষ্প্রবৃত্তি চলিয়া গেল, তখনই দুই স্বর্গীয় প্রবৃত্তি, দুই সাধু আত্মা সেই শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। মহর্ষি ঈশা ও শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া সেই ব্রহ্মপরায়ণ যুবার রক্তনদীর উপকূলে দুই সুন্দর বাগান বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহাদিগের শুভাগমনে সেই সাধুহৃদয়ের ভিতরে দুইটি জীবন্ত উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল। সেই সাধু যুবার চিত্তাকাশে দুইটি সুধাংশু উদিত হইল দুই জন সাধু আসিয়া তাহাকে দুইটি স্বর্গীয় প্রবৃত্তি দান করিলেন। এক জনের পিতার প্রতি অনুরাগ, আর এক জনের প্রভুর প্রতি আনুগত্য। হে জীব, শরীরকে সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিবে। শরীর যদি প্রতিকূল হয়, পাপাচরণ করিয়া শরীরের রক্ত যদি বিষাক্ত হয়, তবে তোমার শরীরের দুর্গন্ধে ঐ দুই মহাপুরুষ পলায়ন করিবেন। শরীরকে শুদ্ধ না রাখিয়া যদি তুমি ঐ দুই মহাপুরুষের জন্য বহু ব্যয় করিয়া জয়পুরের শ্বেত প্রস্তরে দুটি মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, তথাপি তাঁহারা পলায়ন করিবেন। বহুমূল্য লাবণ্যযুক্ত অট্টালিকার পার্শ্বে যদি দুর্গন্ধ পঙ্কিল নরক থাকে, সে অট্টালিকায় রাজারা তো থাকিবেনই না, তাহাতে কাঙ্গালেরাও থাকিবে না। পাপেতে মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যু হইলেই শরীরে দুর্গন্ধ হয়, সেই দুর্গন্ধ শরীরের নিকটে কেহই থাকিতে পারে না। তোমরা কি জান না, এই কলিকাতা মহানগরীতে দুর্গন্ধ স্থানে যদি অতি সুন্দর অট্টালিকাও থাকে তাহা

কেহ লয় না। সেইরূপ পাপ দুর্গন্ধময় শরীর বাহ্যিক শোভায় অত্যন্ত সুন্দর হইলেও তাহা সাধুদিগের মনোনীত হয় না। যাহার শরীরের ভিতর হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতির ভয়ানক দুর্গন্ধ উঠিতেছে, তাহার শরীরের মধ্যে কিরূপে পুণ্যাত্মা সাধুগণ বাস করিবেন? এইজন্য বলিতেছি, হে জীবসকল, তোমরা মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পবিত্রতা সাধন কর। শরীরকে কোন কারণে অপবিত্র হইতে দিও না। শরীরকে লোভী, স্বেচ্ছাচারী, ইন্দ্রিয়াসক্ত ক্রোধান্ধ অথবা অহঙ্কারী হইতে দিও না। শরীরের অস্থির মধ্যে যদি অনবরত জলন্ত বৈরাগ্যানল পোষণ করিতে না পার তবে শরীর বিলাসী হইবে, কেবল ভাল খাইতে চাহিবে, ভাল পরিতে চাহিবে, ভাল শয্যায় শয়ন করিতে চাহিবে। শরীর ঈশ্বরের আদেশ, ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নানাপ্রকার বিলাস সুখ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। তোমরা যদি বল, "আমাদের শরীর যাহা হউক না কেন আমাদের মন উন্নত।" তোমাদিগের সে কথা আমি বিশ্বাস করিব না। দুর্গন্ধস্থানে সোণার বাড়ী যেমন, তেমনই বিলাসপরায়ণ দুর্গন্ধ শরীরের মধ্যে হৃদয় মন। যদি প্রলোভনের অতীত ও নিরাপদ হইতে চাও তবে শরীর মন উভয়কে শুদ্ধ রাখিতে যত্ন কর। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশা, তোমার বক্ষঃস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তোমার মস্তিষ্কে মহাত্মা সক্রেটিস্। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে ঈশা অবতরণ করিয়া তাঁহার স্বর্গস্থ মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন এবং তোমার বক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনামরসে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন এবং তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে সক্রেটিস্ ধর্ম্মচিন্তা পারলৌকিক চিন্তা এবং আত্মজ্ঞান ও নীতিতত্ত্ব দ্বারা তোমার মনকে উজ্জ্বল করিতেছেন। দেখাও যেমন জব্বলপুরের নির্ম্মল প্রস্রবণে লোকে মহা আনন্দ ও মহা আগ্রহের সহিত স্নান করিয়া আপনাদিগকে শুদ্ধ ও সুখী মনে করে, সেইরূপ তোমার রক্তপ্রবাহরূপ নর্ম্মদা নদীতে স্বর্গের সাধুগণ আসিয়া স্নান করিতেছেন। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলির মধ্যে পাঁচটি পুণ্যাত্মা দয়ালু সাধু বসিয়া আছেন। দেখাও তোমার মস্তকের কেশরূপ নিবিড় কাননের মধ্যে সেই প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিগণ আসিয়া ধ্যান

সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এইরূপে যখন দেখিবে যে তোমার সর্ব্বাঙ্গে নানা দেশের এবং নানা যুগের সাধুভক্তগণ আসিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমার রক্তনদীর মধ্যে পৃথিবীর সমুদায় সাধু মাহাত্মা-দিগের রক্ত মিলিয়া গিয়াছে,তখন জানিবে যে তুমি ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছ। নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মগণ সাধুদিগের রক্ত মাংস পান ভোজনরূপ নবব্রত তোমরা সাধন কর। পশুর ন্যায়, ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের ন্যায় আর তোমরা পান ভোজন করিও না। তোমরা ঈশার পুণ্যরূপ অন্ন আহার কর, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ বারি পান কর। পশুজন্তু সকল অসার অন্ন খায়, ভক্তগণ দেবপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সাধুগণ অন্নের মধ্যে ব্রহ্মের প্রেম এবং ব্রহ্মের তেজ আহার করেন। ব্রহ্ম পরিপূরিত অন্ন আহার করিয়া সাধুদিগের মনে যোগবল, ভক্তিবল, পুণ্যবল বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঈশাপ্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে তোমরা আহার পান করিতে আরম্ভ কর। যে ভাবে অন্ন আহার করিলে সাধুজীবন পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই ভাবে তোমরা অন্ন গ্রহণ কর। অকৃতজ্ঞ অভক্তভাবে কদাচ তোমরা ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিও না। আহারকে কদাচ তোমরা ইন্দ্রিয়সুখের পরিপোষক মনে করিও না। অতি পবিত্র ও গম্ভীর ভাবে আহার করিবে। পবিত্রতার অন্ন আহার কর, ভক্তিবারি পান কর। অশুদ্ধ মনে অন্ন ভোজন করিও না, অভক্ত ভাবে জল পান করিও না। ভোজন পান করিবার সময় ঈশা চৈতন্যের জীবন ভোজন পান করিবে, সাধুজীবন আহার না করিলে ভাগবতী তনু লাভ করিতে পারিবে না। তোমার তনু সাধুদিগের সেবায় উৎসর্গ কর। তোমার নিজের জন্য আর তোমার তনু রাখিও না। যিনি তোমার এই তনু সৃজন করিয়াছেন সেই বিশ্বপতি সেই দেহপতি সেই প্রাণারাম, সেই প্রাণাভিরামের সেবায় এই তনু নিযুক্ত করিয়া ইহাকে রামতনু ভাগবতী তনু করিয়া লও। যদি তোমার তনু ঈশ্বরের বিরোধী হয় তবে আর সেই পাপতনুকে আদর করিও না। তোমার চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্ত, পদ, কিম্বা শরীরের কোন যন্ত্র যদি ঈশ্বরের অবাধ্য হয় তবে তাহা কাটিয়া ফেল। তোমার শরীরের সমুদয় অঙ্গ ভাগবতী তনুর অঙ্গ হইবে। তোমার চক্ষু ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন

দ্রব্য দেখিবে না। তোমার কর্ণ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিবে না। তোমার রসনা তাঁহার নামরস ভিন্ন অন্য রস পান করিবে না। মনের আধার এই শরীরকে ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া লইবে। যখন হস্ত দ্বারা তোমার নিজের অঙ্গ স্পর্শ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে তুমি দেবর্ষি-দের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছ। তোমার শরীরের রক্ত মাংস তাঁহাদিগের অধিকৃত এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে। তুমি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, ঈশা গৌরাঙ্গ প্রভৃতি আসিয়া তোমার রক্তনদীতে খেলা করিতেছেন। তোমার শরীর আর তোমার থাকিবে না। তোমার শরীর স্বর্গীয় দেবতাদিগের লীলাক্ষেত্র হইবে। মানুষ ভ্রমান্ধ হইয়া বলে আমার শরীর, তোমার শরীর, উহার শরীর, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেকমানুষের শরীর ঈশ্বর এবং সাধুদিগের লীলার ক্ষেত্র। যাঁহারা সত্যবাদী তাঁহারা বলেন "আমার তনু আমার নহে, ইহা সাধুদিগেরই তনু। এই তনুর উপরে আমার কোন অধিকার নাই।" দয়াময় পিতা কৃপা করুন আমরা যেন সকলে এইরূপ ভাগবতী তনু লাভ করি।

ত্রিনীতিবাদ।

রবিবার, ১৫ চৈত্র, ১৮০২ শক।

ত্রিতাপের শান্তি ত্রিনীতিবাদ। যখন সত্যত্রয় বিজ্ঞানের দ্বারা এক হয়, তখন ত্রিতাপের শান্তি হয়। তিনকে যিনি এক করেন, তিনিই সুখী হন। তাহারা ত্রিতাপে কষ্ট পায় যাহারা তিনকে স্বতন্ত্র মনে করে। এককে যিনি তিনের মধ্যে উপলব্ধি করেন ধন্য সেই সাধু, ধন্য সেই ব্রহ্মজ্ঞানী। নববিধানের আলোক অবলম্বন করিয়া ত্রিনীতি মত বিবৃত করিতেছি, ব্রাহ্মগণ, শ্রবণ কর। ত্রিসত্যের মধ্যে এক সত্য, ত্রিসত্তার মধ্যে এক সত্তা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি উপলব্ধি করা প্রকৃত বিজ্ঞানের কার্য্য। তিন বাস্তবিক মূলে এক। এই সত্য মানিতে হইবে, এই সত্য সাধন করিতে হইবে, এই সত্য সাধন করিয়া সুখী হইতে হইবে। সমুদয় বিবাদের মীমাংসা, সকল বিরোধের সামঞ্জস্য হওয়া কেবল নব-

বিধানের দ্বারাই সম্ভব। অতএব বল, হে নববিধান, তিন কিরূপে এক হইল। ঈশ্বর, আমি এবং জগৎ এই তিন সত্য, এই তিন সত্তা, এই তিন কিরূপে এক হইবে? এই আমি, এই তোমরা, আর আমার এবং তোমাদের মধ্যে ওই ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর। এক ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনের মধ্যে প্রাণরূপে বর্ত্তমান সেই এক সত্য, সেই এক সত্তা ঈশ্বর, তোমার আমার মধ্যে না থাকিলে আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না। মূল সত্য, মূল সত্তা তিনি। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা সকলে অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু এই ঈশ্বর, এই আমি, এই তোমরা, যত ক্ষণ এই তিন স্বতন্ত্র দেখিতেছি তত ক্ষণ আমরা ভ্রমে ভ্রান্ত, ত্রিতাপে সন্তপ্ত। এই ভেদজ্ঞান হইতে নানা প্রকার অধর্ম্ম, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। যত ক্ষণ আমরা এই তিনের মধ্যে এক না দেখিতে পাই, তত ক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারি না। এই তিনের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই প্রকৃত শান্তির অবস্থা। এই তিনকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া যদি ব্রহ্মপূজা করি সেই অপূর্ণ ব্রহ্মপূজাতে পাপের স্রোত বন্ধ হয় না। ব্রহ্মের মধ্যে আমি এবং জগৎ, অথবা জগৎ এবং আমার মধ্যে ব্রহ্ম, এই সত্য স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি না করিলে পুণ্যের পথ শান্তির পথ আবিষ্কৃত হয় না। আমি যদি ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ, কিংবা ব্রহ্ম ছাড়া আমি ভাবিতে পারি, অথবা যদি জগৎ এবং আমি ছাড়া ব্রহ্ম ভাবিতে পারি তবে তিনের ঐক্য হইল না। বাস্তবিক ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। জ্ঞানের অবস্থায় আমরা কোন মতেই ব্রহ্মবিহীন জগৎ কল্পনা করিতে পারি না। ব্রহ্মের মধ্যে জগৎ এবং আমি, আবার আমার মধ্যে ব্রহ্ম এবং জগৎ। ব্রহ্মবিহীন জীব হইতে পারে না। অতএব যখনই আমি আমাকে দেখিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিব। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিত্রাতা ঈশ্বর দূরে নহেন, কিন্তু তিনি প্রত্যেকের প্রাণের মূলে প্রাণরূপে বসতি করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতিজনের সঙ্গে বাস করিতেছেন, সেইরূপ আবার সমষ্টিভাবে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং বিশেষরূপে প্রেরিত মহাত্মাদিগের মধ্যে স্থিতি করিতেছেন। যখন আমরা ঈশ্বরকে মহাপুরুষদিগের

জীবনে দেখি, তখন আমরা ইতিহাসের ঈশ্বরকে মহীয়ান্ করি। প্রথমতঃ বেদবেদান্তের সময় যোগী ঋষিরা নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতেন। ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, তিনি আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যখন ঈশ্বর তাঁহার পুত্র মহাপুরুষদিগের জীবনে অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করেন, তখন পৃথিবী তাঁহাকে পুরাণ কিংবা ইতিহাসের ঈশ্বর বলে। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর পবিত্রাত্মা হইয়া প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রত্যেক জীবাত্মাকে পবিত্র ও উন্নত করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মময় এই জগৎ। কি মহাপুরুষ, কি ক্ষুদ্র আত্মা, প্রত্যেকেই ঈশ্বরেতে জীবিত ও প্রতিপালিত। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও গতি নাই। তিনি প্রতিজনের জীবন, তিনি প্রতিজনের আশ্রয়। এই আমি, এই তোমরা, এই ঈশ্বর, বল এই তিনের মধ্যে যোগ না বিয়োগ? যদি বল এই তিন এক মূলসূত্রে বদ্ধ এবং পরস্পর গূঢ়রূপে গ্রথিত, তবে তোমরা যোগানন্দরসপানের অধিকারী যদি বল এই তিন স্বতন্ত্র, অথবা এই তিনের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গূঢ় যোগ নাই, তবে তোমাদের এই ভেদ জ্ঞান তোমাদিগকে অযোগী ও অবৈরাগী করিয়া তোমাদিগকে নানা প্রকার অধর্ম্মের নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। বিজ্ঞানচক্ষে, বিশ্বাসনেত্রে দেখিতে পাইবে এই তিনের মধ্যে গূঢ় যোগ রহিয়াছে। ব্রহ্ম, আমি এবং জগৎ এই তিন গূঢ় ভাবে সম্মিলিত। তিন সত্যের মধ্যে এক সত্য, ত্রিসত্তার মধ্যে এক সত্তা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি, এই গূঢ় রহস্য বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কদাচ জীব কিংবা জগৎ হইতে পারেন না। পিতা কিরূপে পুত্র হইবেন? স্রষ্টা কিরূপে সৃষ্ট হইবেন? অনন্ত কিরূপে ক্ষুদ্র হইবেন? অথচ এই তিন মূলে এক—এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে। নববিধান এই গূঢ় রহস্য জানিয়াছেন। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দেহ নাই। ব্রহ্ম সৎ চিন্ময় নির্ব্বিকার নিরবয়ব। তিনি সত্যস্বরূপ, পূর্ণ সত্য। তাঁহার সত্য কথন সত্য ধর্ম্মের এক খণ্ড। ইহার জন্য দেহ চাই। সত্য বচন বলিবার জন্য রসনা অর্থাৎ মাংসের প্রয়োজন হইল। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সত্য ঈশ্বরেতে ছিল, জগতের পরিত্রাণের জন্য সেই সত্য মাংস রূপ ধারণ করিল। অর্থাৎ যদিও ঈশ্বর স্বয়ং সত্যস্বরূপ তিনি সাকার মনুষ্যের ন্যায় সত্য কথা বলিতে পারেন না। এই জন্য

পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তাঁহার ইচ্ছাতে রক্তমাংসময় দেহধারী তাঁহার এক জন সত্যবাদী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। সত্য কথা বলিতে হইলেই রসনা চাই, মাংস চাই। আবার সত্য শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ চাই সুতরাং সত্যশ্রবণের জন্যও মাংসের প্রয়োজন হইল। আবার সত্য অনুষ্ঠানের জন্য হস্ত চাই, এই জন্য মনুষ্যকে রক্তমাংসময় হস্ত প্রদত্ত হইল। দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের নিরাকার স্নেহ মাতৃস্তনের আকার ধারণ করে। সেই এক প্রেমময় ঈশ্বর হইতে জননীর হৃদয়ে স্নেহ এবং স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়। এইরূপে বিজ্ঞানচক্ষে দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কি জড়রাজ্যে কি মানবদেহে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের জ্ঞানলীলা এবং প্রেমলীলা। জীবশরীর ব্রহ্মপ্রেমের নিদর্শন। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহার অসীম জ্ঞান এবং অসীম প্রেমের পরিচয় দিতেছে। ক্ষুদ্র শিশুর মুখ যেমন, মাতৃস্তনরূপ দুগ্ধনিঃসারণ যন্ত্র ঠিক তাহার উপযোগী। জীবের নানা প্রকার অভাব মোচন করিবার জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান এবং প্রেম, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, হস্ত, মাতৃস্তন প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করে। এ সমস্ত ঈশ্বরের প্রেমলীলার যন্ত্র। ব্রহ্মের সত্য জিহ্বার আকার ধারণ করিয়া সত্য কথা এবং প্রেমবাক্য বলিয়া পতিত জগৎকে উদ্ধার করে। ঈশ্বরের স্নেহ মাতৃস্ত-নের ভিতর হইতে দুগ্ধের আকারে বাহির হইয়া নিরাশ্রয় ক্ষুদ্র শিশু-দিগের জীবন পোষণ করে। এইরূপে অল্লাধিক পরিমাণে ঈশ্বরের গুণ-সকল মনুষ্যের ভিতরে আকৃতি ধারণ করে। ঈশ্বর স্বয়ং নির্লিপ্ত ও আকৃতিবিহীন, কিন্তু তাঁহার দয়া স্নেহ প্রভৃতি ভাব মনুষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সাধু অসাধু উচ্চ নীচ সকলেই ঈশ্বর তনয়; কিন্তু যাহার রসনা খুব অধিক পরিমাণে হরিনাম করে সেই নরো-ত্তমের জীবনে উজ্জ্বলতর রূপে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু পবিত্র সকলই ঈশ্বরের। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন রসনা একটি সত্য উচ্চারণ করিতে পারে না, কর্ণ একটি সত্য শ্রবণ করিতে পারে না, মন একটী সত্য চিন্তা করিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক সত্য কথনের মধ্যে সত্য স্বরূপের প্রকাশ হয়। ঈশ্বরের সত্য মনুষ্যের

বাসনা দ্বারা উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের আধার; কিন্তু পৃথিবীতে একটী ক্ষুদ্র স্নেহের প্রতিমা মা না থাকিলে আমরা তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিতাম না, অর্থাৎ আমরা তাঁহার অনন্ত সন্তানবাৎসল্যের কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রেম সেই সন্তানের মার মনে স্নেহ, এবং স্তনে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়। ঈশ্বর বলেন, আমি সতীর হৃদয়ে সতীত্বরূপে এবং জননীহৃদয়ে অপত্য-স্নেহরূপে প্রকাশিত থাকিব। সৃষ্টিতে নিয়ত ব্রহ্মের এই বাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে। ঈশ্বরের দয়া মাংস হইয়া প্রেমিক মানবদেহে আকার ধরিতেছে। সেইরূপ নির্ব্বিকার সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ঈশ্বরের বৈরাগ্য বৈরাগী শরীরে মাংসের আকার ধরিতেছে। পৃথিবীর মহাপুরুষদিগের কঠোর বৈরাগ্য ব্রহ্মের অনন্ত বৈরাগ্যের আভাস মাত্র। সেই পরম বৈরাগী ঈশ্বর জীবের শরীরের ভিতরে বসিয়া অনাসক্তি ও আত্মনিগ্রহ রূপে খেলা করিতেছেন। আমার হাত যখন কোন দুঃখী গরিবকে পয়সা দেয়, তখন আমার হাতের ভিতরে ঈশ্বরের দয়ার হস্ত কার্য্য করে। এই কথা শুনিয়া, হে ভ্রান্ত মনুষ্য, কখন বলিও না যে ঈশ্বর মানুষ হইলেন। এইরূপ অসত্য কথা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিও না। কিন্তু বল যে ঈশ্বরের অনন্তপ্রেম বিন্দুরূপে মানুষের মধ্যদিয়া প্রকাশিত হইয়া দুঃখীর দুঃখমোচন করিল। জীবের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের প্রেম বিনিঃসৃত হইল। ঈশ্বর সকল গৌরবের অধিকারী, সকল সৎকর্ম্মের গৌরব তাঁহারই। সৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে কাহারও দর্প করিবার অধিকার নাই। তাঁহার নিকটে সকল দর্প চূর্ণ হইয়া যায়। অত্যন্ত জঘন্য লোক যদি সৎকর্ম্ম করে তাহাও ঈশ্বরের প্রেমের উত্তেজনায় সম্পাদিত হয়। সকল মানুষের ভিতরেই ঈশ্বরের অবতরণ, কিন্তু তাঁহার বিশেষ অবতরণ মহাপুরুষদিগের জীবনে। চক্‌মকির পাথর আঘাত করিলে কিংবা দীপশলাকা জ্বালিলে যেমন অন্ধকার মধ্যে চড়াৎ করিয়া আগুন বাহির হয়, সেইরূপ এই পাপ অন্ধকারময় মলিন হৃদয়ের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যাদেশ বাহির করেন। যখন এইরূপে আমি প্রত্যাদিষ্ট হই, তখনই ইন্দ্রিয় দমন হয় এবং মন ঈশ্বরের পুণ্য শান্তির অধিকারী হয়। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ মৃতসঞ্জীবনী

শক্তি লইয়া জীবাত্মার মধ্যে অবতীর্ণ হয়। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগের ভিতরে আমাদিগের শক্তি হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রাণ হইতে নূতন নূতন প্রেম সঞ্চার হইয়েছে। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি জানেন তিনি আর কোন গুরুর হস্তে নাই, ব্রহ্ম তাঁহাকে পাইয়াছেন এবং তিনি ব্রহ্মকে পাইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম তাঁহার। তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত। ব্রহ্মের সৎস্বভাব তাঁহার স্বভাব। আপনার বক্ষে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া প্রত্যাদিষ্ট আত্মা কি ইতিহাসের মধ্যে কি প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পান। ঈশ্বর ইতিহাসের মহাপুরুষদিগের মধ্যে, ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে, ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট আত্মার ভিতরে এই তিনেতেই ঈশ্বর। যথার্থ পূর্ণ ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইলে ইতিহাস ও প্রকৃতির মধ্যে যে তাঁহার আবির্ভাব ও বিচিত্র লীলা তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর তাঁহার সাধু ভক্ত সন্তানদিগকে ছাড়িয়া তোমাদের বাড়ীতে যাইতে পারেন না। যদি তুমি তাঁহাকে চাও, তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষদিগকেও সমাদর করিতে হইবে। জগতের ইতিহাসে হিন্দু বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি যত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাম লেখা আছে, সে সমস্তকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্ম তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাসীর বাটীতে আবির্ভূত হন। হে ভক্ত, তুমি ইতিহাসের একটি পাতাও কাটিতে পার না। প্রাচীন যোগী ঋষিদিগের মধ্যে ভগবান্ যোগেশ্বররূপে প্রকাশিত, বুদ্ধ দেবের ভিতরে সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগীরূপে, মুসার ভিতরে বিবেক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাজারূপে, ঈশার প্রাণের মধ্যে পিতা ও প্রভুরূপে, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে প্রেমোন্মত্ত সখারূপে। ঈশ্বর দেশে দেশে যুগে যুগে যত লীলা করিয়াছেন এবং তাঁহার যত বিচিত্র স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধান ইতিহাসের কোন অংশ হইতে ঈশ্বরকে বিমুক্ত করিতে পারেন না। হে ব্রাহ্ম, তুমি বলিতেছ তোমার হৃদয় ছোট; কিন্তু ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে তাঁহার সমুদয় বিধান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। যোগী ভক্ত, প্রেমিক, জ্ঞানী, কর্ম্মী, সকলেই তোমার বক্ষের ভিতরে স্থান পাইতে পারেন। এক ঈশ্বর নানা রূপে নানা

প্রকাশ সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। যিনি হিমালয়শিখরে করতলনাস্ত আমলকবৎ যোগীদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিনিই ঈশা মুসা ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছিলেন। সেই তিনিই আজ তোমার আমার প্রাণের মধ্যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন। সেই পুরাতন ইতিহাস ও বর্ত্তমান প্রকৃতির ঈশ্বর ঘনীভূত হইয়া আমার প্রাণের ভিতরে প্রত্যাদেশের অগ্নি জ্বালিয়া দিতেছেন। ইতিহাস, প্রকৃতি এবং আমার আত্মার মধ্যে সেই এক ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। ঐ এক ঈশ্বর পৃথিবীর ভিতর দিয়া, জনসমাজের ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার ভিতরে আসিলেন। আমার মধ্যে তিন এক হইল। যিনি ইতিহাসের ঈশ্বর তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, এবং যিনি ইতিহাস ও প্রকৃতির ঈশ্বর, তিনিই আমার ঈশ্বর। অতএব তিন ঈশ্বর হইল না, এক ঈশ্বর। একেতে তিন মিশিয়া গেল। এক ব্রহ্মসত্তার ভিতরে সমুদয় সত্তা ডুবিয়া গিয়াছে। এক সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে সমুদায় সৃষ্ট সত্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই এক ব্রহ্ম অনন্ত আকাশে বিস্তৃত, ইতিহাসের মহাপুরুষদিগের জীবনে প্রকাশিত, আবার প্রত্যেকের আত্মার ভিতরে অভ্যুদিত।

পাপীর জন্য সাধুর প্রায়শ্চিত্ত।

রবিবার, ২২ চৈত্র, ১৮০২ শক।

ঈশ্বরের একটি কার্য্য আপাততঃ অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। এই কার্য্যটির গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত লোক কুতর্ক করে, এবং কুতর্ক করিয়া ভ্রমে পড়ে। সে অন্যায় কার্য্যটি কি? জগতের দোষের জন্য নির্দ্দোষ সাধুদিগকে কষ্ট দেওয়া। বাস্তবিক অনেকে এই প্রশ্ন করে যদি ঈশ্বর যথার্থই ন্যায়বান্ হন, তবে তিনি জগতের পাপরাশির জন্য তাঁহার ভক্তদিগকে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন? এ কি সুবিচার? এ কি ন্যায় নিষ্পত্তি? কোন্ ন্যায় অনুসারে অপরাধী জগতের জন্য সাধুদিগকে দণ্ড পাইতে হইল? দুষ্ট ব্যভিচারীদিগের জন্য পৃথিবীর মহাপুরুষেরা আপনা-

দিগের জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। তাঁহারা আপন আপন বহুমূল্য রক্ত দিয়া পাপী পৃথিবীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। দুষ্ট পৃথিবী মহাপুরুষদিগের মস্তক ছেদন করিয়া ভয়ানক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিল। ইতিহাস এ সকল নিদারুণ ঘটনা লিখিবার সময় কাঁদিতে লাগিল। ন্যায়বান্ ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর ভক্তদিগের পরিত্রাণের জন্য সাধুজীবন বলিদানরূপে গ্রহণ করেন। অসাধুদিগের কল্যাণের জন্য সাধুরা অকাতরে আপনাদিগের প্রাণ দান করেন। পাপী উদ্ধারের জন্য স্বর্গস্থ প্রভু সাধুদিগের মস্তক চাহিলেন, প্রভুর দাস সাধুগণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগের মস্তক দিলেন। শত শত ভীষণাকার নিষ্ঠুরচিত্ত দানবপ্রকৃতি মনুষ্য পৃথিবীর এক এক জন সাধুর মস্তক ছিন্ন করিল। শত্রুদিগের অস্ত্রাঘাতে সাধুর শরীর হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। সেই রক্তপাতে সাধুর মৃত্যু হইল। কিন্তু সেই এক এক বিন্দু রক্ত হইতে সিন্ধুতুল্য পুণ্য উঠিয়া পৃথিবীর রাশি রাশি পাপ কলঙ্ক ধৌত করিল। নরবলি যদি দিতে হয় তবে ব্রহ্ম-সিংহাসনের সমক্ষে সাধু সজ্জনের জীবন বলি দেওয়াই কর্ত্তব্য। সাধু ভিন্ন আর কে নরবলির উপযুক্ত? যেমন তেমন জীবন ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। সাধু সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হও, তবে ঈশ্বর তোমাকে বলিস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা জগতের পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীন বৈরাগী হইয়াছিলেন, অসাধু পৃথিবী তাঁহাদিগকেই নিষ্ঠুররূপে সংহার করিয়াছে। কোন সাধুকে ক্রুশে হত করিয়াছে, কাহাকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, কাহাকেও হিংস্র জন্তুর নিকটে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছে, কাহাকেও নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়াছে। সাধুদিগের প্রতি অবিশ্বাসী পাপাসক্ত পৃথিবীর ভয়ানক নিষ্ঠুরতা ও নির্য্যাতন স্মরণ করিলে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। এ সকল দুর্ব্বিষহ ঘটনা দেখাইয়া অনেকে জিজ্ঞাসা করে সাধুদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইতে দেওয়া কি ঈশ্বরের অবিচার নহে? পরের জন্য সাধু কেন মরিবেন? কিন্তু সাধুভিন্ন আর কে পরের দুঃখ ভার সহ্য করিবেন? দুঃখী পাপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য আর কে এত ব্যাকুল হইবেন? আর কাহারও স্কন্ধ পাপভার বহন করিতে পারে না। এই জন্য পতিতপাবন ভগবান্ বংশ বংশের পাপ, বংশ

জাতির পাপ, সমস্ত পৃথিবীর পাপভার সাধুর স্কন্ধে স্থাপন করেন। সাধু পরদুঃখে সর্ব্বদা দুঃখী হন। তাঁহার সমস্ত শরীরে পরের দুঃখানলের জ্বালা যন্ত্রণা। হে সর্ব্বত্যাগী সাধু, কৈ তুমি তোমার আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধন সম্পত্তির জন্য এত তো ভাব না, তুমি পরের জন্য কেন ব্যস্ত? পর দুঃখে কেন তুমি দুঃখী হইলে? পরের দুঃখানলে কেন তুমি জ্বলিতেছ? আহা অমুক ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র নাই, অমুক ব্যক্তি রোগে মরিতেছে, অমুক ব্যক্তি কেন সুরাপান করিল, অমুক গ্রামে আজ পর্য্যন্ত কেন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না, কেন এখন পর্য্যন্ত নর নারীর ব্যবহার পবিত্র হইল না, এ সকল চিন্তায় কেন তুমি আপনাকে আকুল করিতেছ? পরের দুঃখের জ্বালায় রাত্রিতে তোমার নিদ্রা হয় না। তুমি দিব নিশি কেবল পৃথিবীর নরনারী সকল কিরূপে শুদ্ধ ও সুখী হইবে এই ভাবিতেছ। হে সাধু, তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়া জগতের সুখে সুখী, জগতের দুঃখে দুঃখী হইয়াছ। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তুমি একীভূত হইয়া গিয়াছ! কি চীন রাজ্যে কি আমেরিকা ভূখণ্ডে যে কেহ কোন প্রকার দুঃখ সহ্য করে তাহা তোমার দুঃখ। অন্য লোক কাঁদিলে তুমি কাঁদ, অন্য লোক হাসিলে তুমি হাস। চীন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত যত দেশ, যত গ্রাম, যত নগর আছে, এ সকল স্থানে যত লোক বসতি করিতেছে তাহাদের সকলের বিপদে তুমি বিপন্ন, তাহাদিগের প্রত্যেকজনের দুঃখে তুমি দুঃখী। তোমার দুঃখভারের পরিমাণ নাই। অন্য লোককে ব্যাঘ্রে কামড়াইল, তুমি মনে করিলে তোমাকে বাঘে কামড়াইয়াছে, অপরের রোগ হইয়াছে তুমি মনে করিলে। তোমার রোগ হইয়াছে, অপরে পাপের জন্য আত্মগ্লানিতে পুড়িতেছে, তুমি মনে করিলে যেন তুমি পুড়িতেছ। বাস্তবিক সাধু হওয়া বিষম দায়। সাধুর মস্তকের উপরে সমস্ত মানবমণ্ডলীর গুরুতর দুঃখভার আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। সাধারণ লোক সাধুর বুকের দুঃখাগ্নির গভীরতা ও তেজস্বিতা বুঝিতে পারে না। সকল পৃথিবী যদি এক জন হয়, তবে সেই এক জন সাধু সজ্জন। স্বার্থপর সংসারের কীট পর দুঃখে কাতর হইতে পারে না। পরদুঃখে কাতর হওয়া, পর দুঃখ মোচন করিবার জন্য স্বার্থ হওয়া, যথার্থ নিঃস্বার্থ সাধুর লক্ষণ। সাধুর আপনার দুঃখ নাই, কিন্তু পর দুঃখে তিনি

দুর্ভিক্ষে দুঃখী। সকলে ঠাণ্ডা জল খাইল, সাধু আগুনের জল খাইলেন। দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল, সাধারণ লোকেরা এ সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া সুখে নিদ্রা গেল; কিন্তু সাধু কাঁদিতে লাগিলেন। সাধু হইবামাত্র আপনার জীবনকে বলির জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে। যে পরিমাণে সাধু সেই পরিমাণে পরের দুঃখভার বহন করিতে হয়। জগতের পাপ দুঃখ ভার লঘু করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে সাধু সন্ন্যাসী, বৈরাগী, যোগী, ভক্ত সকলকে প্রেরণ করেন। যিনি যে পরিমাণে সাধু তাঁহাকে সেই পরিমাণে পরের দোষের জন্য দণ্ড সহ্য করিতে হয়। পরের দোষের জন্য সাধুকে দণ্ড সহ্য করিতে হয়, এই কথা বলা হইলেই অনেকে মনে করে তবে ঈশ্বর অন্যায় আচরণে অপরাধী, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেন না সাধুগণ যে পরের দুঃখে দুঃখী হন তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে দণ্ড নহে, কিন্তু সাধুতার পুরস্কার, এবং তাহা জগতের মঙ্গল সাধনের বিশেষ উপায়। যদি কয় জন মহাপুরুষ জীবন না দেন তবে পাপী জগৎ কিরূপে উদ্ধার হইবে? যখন পাপী বিশ্বাসের সহিত, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই কথা বলিতে পারিবে "অমুক সাধু আমার জন্য মরিয়াছেন" তখন সাধুর জীবনধারণ সার্থক হইবে। জগতের এই স্বাভাবিক উক্তি,— "সাধুরা রক্ত না দিলে উপাসনাবিহীন লোক সকল উপাসনাশীল হইত না, পাপাসক্ত লোক সকল বৈরাগী হইত না।" সাধুর জীবদ্দশায় পতিত জগৎ তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন পাপীরা সাধুর নিঃস্বার্থ উদার ভাব বুঝিতে পারে, তখন তাহারা সাধুর দুঃখ ও মনোবেদনা স্মরণ করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। প্রত্যেক সাধু মহাপুরুষ পাপী জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। প্রায়শ্চিত্তের অর্থ ইহা নহে যে ঈশ্বর সাধুর রক্তে তুষ্ট হন। ভগবান্ কি প্রিয়পুত্রের রক্ত গ্রহণ করিতে ভাল বাসেন? তিনি কি ভক্তরক্ত লোলুপ, না ভক্তবৎসল? প্রায়শ্চিত্তের অর্থ এই যে, যে কেহ পরের দুঃখ স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, কিংবা পরদুঃখ মোচনের জন্য আপনার রক্ত পাত করে, ঈশ্বর বিশেষ আশীর্ব্বাদের সহিত সেই অশ্রু ও সেই রক্ত গ্রহণ করেন এবং ইহা দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেন। হে ব্রাহ্ম, তুমি আপনার স্ত্রী পুত্রের জন্যই বা কত কষ্ট বহন

কর এবং কত রাত্রিই বা জাগরণ কর? তোমার ভাবনার বিষয় তিন চারিটি লোক, কিন্তু যে সাধুর কোটি কোটি সন্তান, তাঁহার কত দুঃখ এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি। যাহার প্রতি তোমার বিন্দু মাত্র ভালবাসা আছে তাহার দুঃখ দেখিলে তোমার কত দুঃখ হয়। আর যে সাধুর প্রেম সমস্ত জগতের প্রতি বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, সমস্ত জগতের দুঃখে তাঁহার কত দুঃখ। হে গৃহস্থ ব্রাহ্ম, তুমি একটি ক্ষুদ্র পরিবারের দুঃখ ভার বহন করিতে পার না, আর যিনি শত শত গ্রাম, শত শত নগর এবং বড় বড় ভূখণ্ডের দুঃখ ভার বহন করেন তাঁহার দুঃখের গুরুত্ব কেমন অসহনীয়। সাধুর মনে যত দয়া বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ পরদুঃখ মোচন করিবার জন্য যত আকুলতা বাড়ে, তত তাঁহার দুঃখ বৃদ্ধি হয়। পরদুঃখহারী ঈশ্বর সাধুদিগকে এই নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন। সাধু হইলেই শত শত দেশের দুঃখভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হয়। সাধুরা যতই পৃথিবীর বিলাস লালসা পাপাসক্তির আগুন এবং রাশি রাশি দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতে পান, ততই তাঁহারা সহানুভূতি জন্য পরদুঃখের জ্বালায় অস্থির হন। এই দুঃখ অথবা দয়ার জ্বালাতেই তাঁহারা মরিয়া যান। সাধুদিগকে বধ করিবার জন্য ক্রুশ অগ্নি অথবা শেলকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা আপনাদিগের দয়ার জ্বালাতেই আপনারা দগ্ধ হন। দয়াশীল পুরুষেরা জানেন দয়ার আগুন কেমন অসহ্য আগুন। প্রেমিক ব্যক্তি জানেন প্রেমের আগুন কেমন অসহনীয়। যেমন বাতি অপরকে আলোক দান করিয়া আপনার আগুনে আপনি ক্ষয় হইতে থাকে এবং ক্রমে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ মহাপুরুষেরাও পৃথিবীর দুঃখী পাপীদিগকে সুখী করিবার জন্য প্রেমালোক দিতে দিতে আপনাদিগের প্রেমানলে আপনারা দগ্ধ হন। "হে প্রেমিকদল, তোমরা পরের জন্য প্রাণ দেও," সাধুদিগকে একরূপ উপদেশ দিতে হয় না। তাঁহারা আপনাদিগের প্রেমের উত্তেজনাতেই আপনারা মরিয়া যান। হে ভারতবর্ষের নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মগণ, পৃথিবীর সাধুদিগের জীবন অথবা মরণ দেখিয়া তোমাদিগের মনে কি কোন মহৎ ভাবের উদয় হয় না? পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তোমরা কয় জন যদি ঈশ্বরের চরণে জীবন উৎসর্গ না কর তবে হিন্দুস্থানের অধর্ম্মপাপের জন্য আর কে প্রায়-

শ্চিত্ত করিবে ? এত শতাব্দীর রাশীকৃত পাপ জঞ্জাল দূর করিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড জনহিতৈষী সর্ব্বত্যাগী সাধুদল চাই। অসাধারণ দয়া, অসাধারণ হিতৈষণা চাই। দুই এক জন সামান্য লোক হাজার বৎসরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে না। নববিধানের বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এক-হৃদয় হইয়া জাগিয়া উঠ। তোমাদিগের জীবনে যাহা কিছু ঈশ্বরের ভাব স্বর্গীয় ভাব আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া পতিত জন্মভূমিকে উন্নত ও উদ্ধার কর। অসাধারণ সহিষ্ণুতা, অসাধারণ দয়া, অসাধারণ বিশ্বাস, অসাধারণ বৈরাগ্য, অসাধারণ আত্মজয়, অসাধারণ পরসেবা প্রভৃতি সদ্গুণ না দেখিলে বিপথগামী জগৎ ফিরিবে না। যেমন রোগ কঠিন ও বহুদেশব্যাপী তেমনি ঔষধও খুব শক্ত এবং প্রবল হওয়া আবশ্যক। যেমন পাপ, উহাকে জয় করিতে তেমনি বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত, আত্মজয়ের দৃষ্টান্ত, কিংবা বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত কি কেবল এক জন লোকে বদ্ধ থাকিতে পারে ? প্রেরিত মহাপুরুষেরা জগতের পরিত্রাণের জন্য, অকাতরে আপনাদিগকে বলিদান করিলেন। প্রেরিত প্রচারকেরাও সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া উচ্চ ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। হে গৃহস্থ ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াও জগতের পরিত্রাণের জন্য কিছুই করিবে না ? বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত কি কেবল মহাপুরুষ ও প্রচারকদিগের মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে ? ভগবানের কি ইচ্ছা নয় যে গৃহাশ্রমেও বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হউক ? "কল্য-কার জন্য ভাবিও না" এই উপদেশ কি কেবল অল্প কয় জন লোকের জন্য ? না। ভগবানের ইচ্ছা কি সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, কি গৃহস্থ বৈরাগী সকলেই এই নিয়ম পালন করেন। হে ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের ভ্রাতারা দেশের পরিত্রাণের জন্য বৈরাগী হইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া গেলেন, তোমরা কোন্ প্রাণে ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয় বাসনার দাস ও সংসারের কীট হইয়া থাকিবে ? পর দুঃখে কি কখনও তোমাদের দুঃখ হয় না ? দেশের যুবারা কেন উপাসনাশীল হইল না ? স্ত্রীরা কেন ব্রাহ্মপরায়ণা হইল না ? বালক বালিকারা কেন সুনীতিপরায়ণ হইল না, এ সকল সচ্চিন্তা ও জগতের কল্যাণকামনা কি তোমাদিগের স্বার্থপর মনে কদাপি স্থান পায় না ? তোমরা কোন্ প্রভুর সেবা কর ? তোমরা কাহার জন্য সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে

পরিশ্রম কর? আর তোমরা স্বার্থপর বৈরাগ্য বিহীন বিষয়ী হইয়া সংসারের সেবা করিও না। তোমরা দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা যত অর্থ অর্জ্জন করিবে তৎসমুদয় সেই সর্ব্বত্যাগী ভগবানের হস্তে অর্পণ করিও। তোমরা আর কদাচ আপনাদিগের ও আপনাদিগের পরিবারের ভরণ পোষণের বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে কলঙ্কিত করিও না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর কর। ভগবান্ নিত্য এই কথা বলিতেছেন;— "কেবল প্রেরিতেরা কল্যকার জন্য ভাবিবে না তাহা নহে, কিন্তু কাহারও কল্যকার জন্য ভাবা উচিত নহে, কেন না আমি প্রতিজনের পিতা এবং প্রতিপালক।" নববিধান ভগবানের এই বাক্য সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিতেছেন। ঈশ্বরের আদেশে নববিধানাশ্রিত সকলেই ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনদিগের প্রদর্শিত বৈরাগ্য পথে চলিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া পূর্ণ বৈরাগ্য পথে চলিতেছেন। অল্পত্যাগী গৃহস্থ ব্রাহ্মেরাও আপনাদিগের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া বৈরাগ্যপথে চলিবেন। প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল গৃহস্থ ব্রাহ্ম ভগবানের হস্তে উপার্জ্জিত সমস্ত ধন সমর্পণ করিয়া সংসারাশ্রমে যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিবেন। যেমন সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের পাত্র, সেইরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বৈরাগীও তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্র।

বিষয় এবং বৈরাগ্য।

রবিবার, ২৯ চৈত্র, ১৮০২ শক।

বিষয় এবং বৈরাগ্য দুই দিকে, মধ্যস্থলে গোলাকার পৃথিবী। এক বার বিষয় টানিতেছে পৃথিবীকে, আর এক বার বৈরাগ্য টানিতেছে পৃথিবীকে। নিয়ত এই দুয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। অনেক দিন যদি পৃথিবী বিষয়ী থাকে, আবার বৈরাগ্য প্রবল হইয়া পৃথিবীর উপর আপনার আধিপত্য স্থাপন করে। পৃথিবীতে যত বার বিষয়িদল প্রবল হইয়াছে, তত বার মহা বৈরাগী সকল আসিয়া প্রকাণ্ড বৈরাগ্যের অনল প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া-

ছেন। বৈরাগীগণ বিষয়াসক্ত রুগ্ন পৃথিবীর সুচিকিৎসক। প্রবল বিষয়-রোগ দূর করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগী ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রকৃত বৈরাগীগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন। প্রধান প্রধান সাধুগণ ইতিপূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিয়া গিযাছেন যে যখনই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়াসক্তি, পাপ ব্যভিচার প্রবল হইবে, তখনই স্বর্গ হইতে মহাবীর বৈরাগীর দল আসিয়া মায়াপাশ ছেদন করিয়া পৃথিবীকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। বিষয়ের মহৌষধ বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-ঔষধ সেবন ভিন্ন বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়িনী কৃপার এমনই আয়োজন যে যখনই পৃথিবীতে বিষয়ের প্রাবল্য হয়, তখনই বৈরাগ্যের প্রাচুর্ভাব হয়। যখনই বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবী মৃতপ্রায় হয় তখনই স্বর্গ হইতে বৈরাগীদল আসিয়া রুগ্ন পৃথিবীর চিকিৎসা ও রোগ প্রতীকার আরম্ভ করেন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশা জানিয়াই রক্ষাকালী, অনন্তকালী, সর্ব্বশক্তিময়ী মহাকালী এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষদিগের শুভাগমন কেন হয়? এই ঘোর বিষয়াসক্ত পৃথিবীতে সময়ে সময়ে বৈরাগীদল কেন আসেন? পৃথিবীর এত লোক কেন সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া বৈরাগী হন? ব্রহ্মচারী বৈরাগীগণ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন কেন? ধর্ম্মের জন্য এত কষ্ট সহ্য করেন কেন? সংসারের সুখ সম্পদের নিকট বিদায় লইয়া কষ্টকুটীরে বাস কেন? এ সমুদয় তীব্র কঠোর বৈরাগ্য সাধনের কারণ কি? কারণ কেবল পৃথিবীর বিষয়াসক্তি। পৃথিবীতে যখন বিষয়াসক্তি ষোল আনা হয়, তখন তাহা নির্ব্বাণ করিবার জন্য বৈরাগ্যও ষোল আনা চাই। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ। বৈরাগ্য কি? হোমের অগ্নি। প্রাচীন যোগী ঋষি অগ্নিহোত্রিগণ যেমন অগ্নি জ্বালিয়া নিত্য হোম করিতেন এবং বায়ুশুদ্ধ করিতেন, সেইরূপ বৈরাগীগণ আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়দমন, মন-সংযম প্রভৃতি বৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়া পাপাসক্তি ও বিষয়কামনা ভস্মীভূত করেন। প্রেরিত বৈরাগীগণ দেখিতে পান, পৃথিবীতে অনেক শতাব্দী হইতে বিষয়াসক্তি উৎকট রোগের আকার ধারণ করিয়াছে, সামান্য বৈরাগ্যে এই রোগের উপশম হইবে না, এই জন্য তাঁহারা একেবারে পূর্ণ বৈরাগ্যের

পথ অবলম্বন করেন। বিধাতা পুরুষ যখনই দেখিতে পান যে তাঁহার প্রজা সকল উৎকট বিষয়রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে, তাহাদিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক দল সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রস্তুত করিতে থাকেন। যেখানে বার লক্ষ লোক বিষয়-বিষপান করিয়া মরিতেছে, সেখানে অন্ততঃ বার জন বৈরাগী প্রয়োজন। যেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক বিষয়ী হইয়া মরিতেছে, সেখানে অন্যূন পঞ্চাশ জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যে পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক বিষয়গরল পান করিয়া মরিতেছে, সেখানে রোগ দমন করা দুই এক জন সামান্য কবিরাজের কর্ম্ম নহে। যেখানে বিষয়-রোগ অতি সামান্য সেখানে যৎসামান্য অল্প পরিমাণ বৈরাগ্য সাধনা দ্বারা সেই রোগ দূর হইতে পারে; কিন্তু যেখানে বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সামান্য ঔষধে প্রতীকার সম্ভব নহে। যেমন কঠোর রোগ সেইরূপ উপযুক্ত ঔষধ আবশ্যক, এই জন্য পৃথিবীর উৎকট বিষয়-রোগ দূর করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান বৈরাগীগণ কেবল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে পৃথিবীর যেরূপ কঠোর সাংঘাতিক রোগ তাহাতে কয়েক জন লোক প্রাণ না দিলে মানুষ এই বিষম রোগ হইতে একেবারে রক্ষা পাইবে না, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট আত্মবলিদান করিলেন। যখন বড় বড় বৈরাগীগণ বিষয়াসক্ত কঠোর মনুষ্যমণ্ডলীকে বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত সকল দেখাইতে লাগিলেন, তখন পৃথিবী পরাস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "হে বৈরাগী ভ্রাতৃগণ, আমাদিগের জন্য তোমরা অনায়াসে এত কষ্ট সহিলে, তোমাদিগের দুর্লভ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়াছ। তোমাদের ব্যবহারে আমরা পরাস্ত হইলাম। ভাইগণ আর আমরা নাস্তিক হইব না, আর অপবিত্র আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিব না, আর টাকার জন্য উন্মাদ হইব না, আর অসাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চারিদিকে ব্যভিচার অধর্ম্ম বৃদ্ধি করিব না, আর তোমাদিগের দয়ার্দ্র কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিব না।" ইহা অপেক্ষা কঠোরতর রোগের সময় নিদারুণ পৃথিবী কখন খড়্গ দ্বারা কখন অগ্নি দ্বারা কখন ক্রুশ দ্বারা

অথবা অন্য প্রকারে জগতের হিতৈষী বৈরাগীদিগকে. প্রাণে বধ করিয়াছে। দুর্দান্ত পৃথিবী বলিয়াছে "হে বৈরাগীগণ, আমরা তোমাদের ঈশ্বরকে মানি না, আমরা নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা খুসী তাহা করিয়াছি এবং ঘোর মোহনিদ্রায় অচেতন ছিলাম, এমন সময় কোথা হইতে তোমরা আসিয়া নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা এবং ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছ। আমরা আমোদ প্রমোদ ও মদ্যপান করিতে গিয়াছিলাম, তোমাদের দল আমাদিগকে সে সকল আমোদ প্রমোদ করিতে দিল না। তোমরা আমাদের ভয়ানক শত্রু, অতএব তোমাদিগকে এই সংহার করিতেছি।" এই বলিয়া আগুন জ্বালিল, ক্রুশ তুলিল, বাণ ছুড়িল এবং সাধুদিগকে মারিল। এইরূপে দেশে দেশে, যুগে যুগে, নিষ্ঠুর ভীষণাকার জন্তু-প্রকৃতি, দানবসমান বিষয়িদল নানা প্রকারে সাধু বৈরাগীদিগকে বধ করিয়াছে। বিষয়াসক্ত মূঢ় মানব অনেক সময় বৈরাগীদিগকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে তীব্র অনুতাপ অস্ত্রে আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়াছে। বৈরাগী না মরিলে পৃথিবীর উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। অতএব, হে প্রেরিত বৈরাগীগণ, পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য তোমরা ঈশ্বরের চরণে আত্মবলিদান কর। হে নববিধানের বৈরাগীদল, হে নববিধানের সাধকদল, সামান্য বৈরাগ্যে হইবে না, এই সাগরসমান বিষয়াসক্তি সামান্য বৈরাগ্যে কিরূপে তোমরা দূর করিবে? তোমরা এখন বৈরাগী হও, যাহাতে সমস্ত হিন্দুস্থানবাসীরা তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখিয়া কাঁদিবে এবং বিষয়-রোগমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। হে বন্ধুগণ, যদি তোমরা একেবারে বিষয় সুখের লালসা ছাড়িলে মাতৃ ভূমির পরিত্রাণ হয়, তবে আর তোমরা বিলম্ব করিও না। যদি তোমাদের একটি আঙ্গুল কাটিলে এক লক্ষ লোক বাঁচে তবে কোটি কোটি লোককে বাঁচাইবার জন্য তোমাদিগকে কত রক্ত দিতে হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। যে পরিমাণে বিষয়-রোগ উৎকট সেই পরিমাণে বৈরাগ্য ও ত্যাগস্বীকার চাই। ইহা অভ্রান্ত গণিতশাস্ত্রের কথা। ইহা ধর্ম্মসাধনের চমৎকার অঙ্কশাস্ত্র। প্রভু পরমেশ্বর রোগের পরিমাণ বুঝিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বৈরাগ্য প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে এখন বিষয়-রোগ ভয়ানক প্রবল হইয়াছে,

এই সময় পূর্ণ ষোল আনা বৈরাগ্য ভিন্ন জীব উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। এই জন্য ভগবান্ তাঁহার সমুদয় বৈরাগীদিগকে সম্মিলিত করিয়া নব বিধানের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। ঈশ্বর প্রাচীন যোগী ঋষিগণ, শাক্য, ঈশা, এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বড় বড় বৈরাগীদিগকে একত্র লইয়া এই নববিধানের জগতে অবতরণ করিলেন। যখন প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীরগণ, সর্ব্বোত্তম বৈরাগীগণ সংসারাসক্তির বিরুদ্ধে একত্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন তখন রণক্ষেত্রে ভয়ানক কামানের শব্দ হইল। ক্ষীণ হীন বিষয়িদল এ সকল মহাযোদ্ধাদিগের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিল না। হে নববিধানবাদিগণ, তোমাদিগের আর ভয় কি? দিগ্বিজয়ী বড় বড় বৈরাগী মহাজনগণ তোমাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের বলে বলী হইয়া মেদিনী কাঁপাইয়া হুঙ্কার করিতে করিতে সংসার জয় কর, বিষয়াসক্তি রাক্ষসীকে একেবারে চিরকালের জন্য সংহার কর। তোমরা নববিধানের লোক। তোমাদিগের বৈরাগ্য এত অধিক প্রবল হইবে যে তাহা দেখিয়া বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়াপন্ন হইবে। ভ্রাতৃগণ, এদেশে ভয়ানক বিষয়রোগে সহস্র সহস্র লোক মরিতেছে, এই সময় তোমরা পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিষয়কে পরাজয় কর। বিষয়রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া তোমরা বিষয়াতীত ব্রহ্মরাজ্যের প্রজা হও। দেখ, তোমাদিগের সমক্ষে বিষয়-বাসনারূপ জ্বর আসিয়া কত শত লোকের প্রাণ বধ করিতেছে। ভাই ভগিনীদিগের মৃত্যু কিংবা উৎকট রোগ দেখিয়া কিরূপে তোমরা উদাসীন থাকিবে? বার বার যুগে যুগে বিষয়িদল পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু আবার ঐ দেখ চারিদিকে বিষয়ীরা প্রবল হইয়াছে। আবার তোমরা স্বর্গের বৈরাগীদিগকে ডাকিয়া বিষয়িদলের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ কর। প্রাচীন যোগী ঋষিগণ, শাক্য ঈশা ও চৈতন্য প্রভৃতি প্রমত্ত বৈরাগীদিগকে ডাকিয়া বিষয়াসক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নির্ব্বাণ, বৈরাগ্য, ক্ষমা, শান্তি, প্রভৃতি দুর্জ্জয় অস্ত্রাদি দ্বারা বিষয়ীদিগকে পরাস্ত করিয়া ঈশ্বরের দিকে টানিয়া আন। এই শতাব্দীতে আবার বিষয়ীরা হুঙ্কার করিতেছে ইহা দেখিয়া নববিধান বলিলেন "আমি সংসার অসুরকে জয় করিবার জন্য পৃথিবীতে চলিলাম।" নববিধান আসিয়া সংসারাসক্তিকে কাঁপাইয়া

বজ্রধ্বনিতে বলিলেন "রে দানব, রে রাক্ষস বিষয়, তোর মস্তক আমি ছেদন করিব।" এই বলিয়া নববিধান একেবারে প্রথমেই উপদেশ দিলেন "স্বার্থ নাশকর, বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ কর, অন্ন বস্ত্র চিন্তা করিও না। নিজের জন্য ধন স্পর্শ করা কলঙ্ক মনে করিবে, মরিয়াও যদি যাও কল্যকার জন্য ভাবিবে না।" এই উপদেশ গোলাতে ঈশা সংসারকে মারিয়াছিলেন, নববিধানও এই গোলা ছুড়িতেছেন। হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা যদি অল্প অল্প বৈরাগ্য সাধন দ্বারা ধর্ম্ম এবং বিষয়ের সেবা কর তাহা হইলে তোমরা আপনারাও পরিত্রাণ পাইবে না এবং জগতেরও হিত সাধন করিতে পারিবে না। পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন করিতে করিতে অন্ততঃ পাঁচ জন তোমরা মরিয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুতে ভারত বাঁচিবে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি দেশ শুদ্ধ লোক বৈরাগী হয় তবে সংসার রক্ষা কে করিবে? হে ব্রহ্ম ভক্ত বৈরাগী, তোমার এ ভাবনা নহে। ভগবানের চিন্তাভার তুমি মস্তকে লইও না। তুমি কেবল এই ভাবিবে কৈ পাঁচজনও ত বৈরাগী হইল না। ভয়ানক বিষয়গরল পান করিয়া লোকগুলি মরিতেছে। তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য তোমরা বৈরাগ্যানলে দগ্ধ হও, বুক কাট, রক্ত দাও। যখন তোমরা পরের কল্যাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া মরিতে যাইবে তখন দেশের লোকে বলিবে, "এরা আমাদের জন্য মরিতেছে, এস ভাই, আমরা কুপথ পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগের ব্রহ্মমন্দিরে যাই, ইহাদিগের ধর্ম্ম সাধন করি। আমরা যদি পাপ নাস্তিকতা ছাড়িলে এরা বাঁচে তবে আর কেন আমরা বিষয়ের বিষ খাইব? আমরা বিষয়ের নরকে মরিব, আর এরা বৈরাগ্যের অনলে মরিয়া গৌরবের মুকুট মস্তকে পরিয়া স্বর্গে যাইবে?" এই সকল কথা বলিয়া ঘোর বিষয়ীরাও বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, তোমরা সমুদয় স্বর্গীয় বৈরাগীদিগের ভাব গ্রহণ কর, বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ অবজ্ঞা করিও না। যাঁহারা এত বড় মহাত্মা ছিলেন, তাঁহারা যে অকারণে গৈরিক, দণ্ড, কমণ্ডলু ঝুলি, একতারা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। যে মাটীতে কোন বৈরাগী বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন, সেই মাটীকে নমস্কার কর, যে নদীর জলে কোন

পুণ্যাত্মা আপনার তনুকে ধৌত করিয়াছেন, সেই নদীকে নমস্কার কর। ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলেই যে বৈরাগী হইবে তাহা নহে। ব্যাঘ্রচর্ম্মে বৈরাগ্য নাই, গৈরিক বর্ণ পুণ্যের রং নহে। তথাপি এ সকল লক্ষণকে অবজ্ঞা করা ভক্তের লক্ষণ নহে। মহাপুরুষব্যবহৃত সন্ন্যাসচিহ্ন সকল তোমাদের শ্রদ্ধেয়। তোমরা ভক্তির সহিত ঐ সমুদায়কে বরণ করিবে এবং উহার অসার ভাগ ছাড়িয়া দিয়া বৈরাগ্যের প্রত্যেক চিহ্নের ভিতর হইতে সার রত্ন আদায় করিয়া লইবে। নববিধানের বেদী হইতে এ কথা বলিতে পারি না, এ কথা বলিতেছি না যে তোমরা শস্য অপেক্ষা খোসাকে অধিক আদর কর, কিন্তু এই কথা বলিতেছি পৃথিবীর সমুদয় ক্ষুদ্র বড় বৈরাগীর পদধূলি অন্তরের অন্তরে গ্রহণ কর। হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি সেই সাধু বৈরাগীদিগের প্রদর্শিত পথে না চলিলে স্বর্গে যাইতে পারিবে না। বৈরাগীদিগকে নমস্কার কর। বৈরাগ্যকে ভক্তির সহিত গ্রহণ কর এবং সেই বৈরাগীদিগের রাজা, বৈরাগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া সংসারাসক্তি জয় করিয়া সংসারের মধ্যে যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিয়া সপরিবারে, সবান্ধবে বৈরাগীদল হইয়া জগৎকে উদ্ধার কর।

ভবিষ্যতের সন্তান।

রবিবার ৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক।

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি ভূতকালের, না বর্ত্তমানের, না ভবিষ্যতের? তোমার সম্মুখে কালের চাতুরী, কালের বিচিত্র লীলা। এই রাত্রি, এই দিন, এই পুরাতন বৎসর, এই নব বৎসর, এই এক শতাব্দী অতীত হইল, এই আর এক শতাব্দী আরম্ভ হইল। বৎসর আসিতে যেমন তাড়াতাড়ি, যাইবার সময়ও তেমনি তাড়াতাড়ি। কাল দৌড়িয়া আসে, দৌড়িয়া যায়। আমরা কোন্ কালের লোক? আমরা কি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিব? যে কাল অতীত হইল আমরা তাহার নহি, যে কাল বর্ত্তমান আমরা তাহারও নহি, যে কাল আসিবে আমরা তাহার। কাল দ্রুতবেগে

চলিয়া যাইতেছে, তবে আমরা কাহার উপরে আমাদিগের ভার সমর্পণ করিব? দ্রুতগামী তরল কালের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। অস্থির বাতাসের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভব? এত যেখানে পরিবর্ত্তন, সময়ের যেখানে কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, আমরা সেখানে কিরূপে দাঁড়াইব? যাহা ছিল তাহা গেল, যে বৎসর আসিল ইহা নূতন বৎসর। যে পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল তাহার উপর তো বিশ্বাস হইতেই পারে না। আর যে নববর্ষ আসিল ইহার উপরেই বা বিশ্বাস কি? বড় ভাই পুরাতন বৎসরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, কনিষ্ঠ ভাই নূতন বৎসরকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রাচীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, সদ্যোজাত শিশুর উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। জ্ঞানী ব্রাহ্ম, বাস্তবিক তুমি ভূতের পুত্র নহ, তুমি বর্ত্তমানেরও সন্তান নহ, তুমি ভবিষ্যতের সন্তান ভূতকাল তোমার জন্মস্থান নহে, ভূতকাল তোমার বাসস্থান নহে, বর্ত্তমান কালও তোমার জন্ম স্থান কিংবা বাসস্থান নহে। তোমার বাড়ী ভবিষ্যতে। তোমার নববিধান তোমার স্বর্গরাজ্য, তোমার দেবালয়, তোমার সুখী পরিবার, এ সমুদয় ভবিষ্যতে। হে ভবিষ্যতের সন্তান, তোমার সময় এখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই। তোমার স্বদেশ কলিকাতা কিংবা পৃথিবীর কোন স্থান নহে। তোমার জীবন এই শতাব্দীর জীবন নহে। বহু শতাব্দী পরে তোমার শতাব্দী আসিবে। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা কয় জন ভবিষ্যতের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ। তোমাদিগের মত ভবিষ্যদ্দর্শী বিচক্ষণ সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কালের স্রোতের উপর, ঋতু পরিবর্ত্তনের উপর আশা ভরসা রাখিবে না। তোমরা যে দেশবাসী সেখানে কালের খেলা নাই, ঋতু পরিবর্ত্তন নাই, বৎসর শতাব্দীর আরম্ভ শেষ নাই। সেখানে স্রোতস্বতী নদী নাই, সেখানে কাহার জীবন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় না। সেই দেশ হইতে কয়েকটী যাত্রী ক্রমাগত হাটিতে হাটিতে কলিকাতা আসিল। তাহাদিগের মুখ ভবিষ্যতের দিকে, স্বর্গের দিকে; তাহারা পশ্চাতে হাটিতেছে। পৃথিবীর লোক তাহাদিগের নাম ধাম জানে না। পৃথিবীর লোক তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে না। তাহাদিগের ভাষা সংস্কৃত নয়, হিব্রু নয়, গ্রীক নয়,

ইংরাজী কি বাঙ্গালাও নহে। তাহাদিগের ভাষা ভবিষ্যতের ভাষা, তাহা পৃথিবী এখনও শিখে নাই। হে ভবিষ্যতের সন্তান ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের ভাষার বর্ণমালার ক খ এ এখন পর্য্যন্ত কেহ শেখে নাই। জগদ্বাসী সকলে বলিতেছে; "হে বিধান ভাই, তুমি বাঙ্গালা বলিলে না, ইংরাজী বলিলে না, কিরূপে আমরা তোমার ভাষা বুঝিব, আমরা বর্ত্তমানের লোক, তুমি কি ভবিষ্যতের অমৃতসম স্বর্গরাজ্যের কথা বলিতেছ, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কত কথা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিলে, কিন্তু কিছুতেই আমাদিগের বোধগম্য হইল না।" বাস্তবিক নববিধানবাদীদিগের দুর্ব্বোধ কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতেছে, "ইহারা কি প্রকার মনুষ্য।" হে ভাবী ব্রহ্মরাজ্যের অধিবাসিগণ, তোমরা বিধির খেলা খেলিবার জন্য এই ভবধামে অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়াছ। তোমাদিগের জন্ম এক অদ্ভুত রহস্য। কল্যকার জীব অদ্য জন্মে। দশ সহস্র বৎসর পরে যাহারা জন্মিবে তাহারা এখন জন্মিয়াছে। তোমরা যে ক্ষেত্রে কার্য্য করিবে, সেই ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বোধ হয় যেন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পথ ভুলিয়া তোমারা এদেশে আসিয়াছ। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা ঈশা, মুসা, শাক্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকটে বসিতে, তোমরা এখানে আসিলে কেন? তোমরা দেশ কালের ব্যবধান বিনাশ করিলে। তোমরা যে দেশের লোক সেই দেশ আর এই দেশের মধ্যে অনেক ব্যবধান, তোমরা যে দেশে থাক সে দেশের সকলই অদ্ভুত। সেখানে কত যোগীভক্ত, কত প্রেমিকবৈরাগী, কত ঋষিকর্ম্মী, কত প্রেমোন্মত্ত জ্ঞানী বাস করিতেছেন, আর এখানে যে বৈরাগী সে প্রেমিক নহে, যে যোগী সে ভক্ত নহে, যে কর্ম্মী সে জ্ঞানী নহে। এখানে যে গৃহস্থ সে কেবল তাহার আপনার স্ত্রী পুত্রাদি লইয়াই ব্যস্ত, তাহার জীবনে বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, এই হতশ্রীদেশে গৃহস্থবৈরাগী নাই। এখানে যে যোগী সে কেবল যোগ ধ্যানেতেই মগ্ন, তাহার জীবনে ভক্তির চিহ্ন দেখা যায় না, অথবা যে ভক্ত সে কেবল ভক্তির ব্যাপার ও নাম কীর্ত্তন লইয়াই ব্যস্ত, তাহাকে কখন যোগ সমাধিতে নিমগ্ন দেখা যায় না, এখানে ভক্ত যোগী নাই।

এখানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঐক্য নাই। এখানে যদি তোমরা কাহাকেও ও ভাই হিন্দু-বৌদ্ধ, ও ভাই বৌদ্ধ-খৃষ্টান্, ও ভাই খৃষ্টান্ মুসলমান্, ও ভাই চিন্-ইংরেজ, ও ভাই গৃহস্থ-বৈরাগী, ও ভাই যোগী ভক্ত কিংবা ও ভাই কর্ম্মীজ্ঞানী বলিয়া ডাক, কেহই উত্তর দিবে না। এখানে প্রতিজনেই সাম্প্রদায়িক, এখানে প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ক্ষুদ্র ভাবেই সন্তুষ্ট। তুমি যদি বল ওহে মিষ্টলবণ সমুদ্র, একটু মিষ্ট জল দেও, সে বলিবে আমি লবণ সমুদ্র, আমি লবণ ভিন্ন আর কিছু দিতে পারি না, যদি মিষ্ট জল চাও তবে মিষ্টরস সরোবরের নিকট যাও। এখানে এক আধারে সকল রস পাওযা যায় না, এখানে একে অন্যের সংবাদ লয় না। এখানে যোগী ভক্তের সংবাদ লয় না, কর্ম্মী জ্ঞানীর সংবাদ লয় না, গৃহস্থ বৈরাগীর সংবাদ লয় না, বৈরাগী গৃহস্থের সংবাদ লয় না। এখানে যদি তুমি কাহাকে ওহে বৈরাগী গৃহস্থ বলিয়া সম্বোধন কর, তোমাকে সকলে উপহাস করিবে এবং তুমি কি বলিতেছ, তোমার কথা কেহই বুঝিতে পারিবে না। যখন তুমি বল কর্ম্মী যোগী, জ্ঞানী ভক্ত, বালক বৃদ্ধ, হিন্দু ইহুদী, অথবা ঈশাবাদী বৌদ্ধ তোমার এ সকল কথা পৃথিবী কিছুই বুঝিতে পারে না। পৃথিবী বলে "নববিধানের লোকেরা কি অসম্ভব অসঙ্গত কথা বলে কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহারা বলে, মনোবনে বসিয়া গৃহধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে; প্রমত্ত বৈরাগী হইয়া সংসারে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম পরিবার গঠন করিতে হইবে; যোগ ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া ভক্তিভাবে নৃত্য করিতে হইবে। সংসারের ভূমিকে হিমালয়ের উচ্চ শিখর মনে করিতে হইবে। এইরূপ কত অদ্ভুত কথা বলিয়া ইহারা বক্তৃতা করে ও সংবাদ পত্রাদি লেখে, কিছুই বুঝিতে পারি না। ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র খানিক গৈরিক, খানিক শাদা ধুতি। ইহাদের এক চক্ষু ভূতকালে, আর এক চক্ষু ভবিষ্যতের দিকে। ইহারা কি খায়? খাইবার সময় পরলোকগত সাধু বৈরাগীদিগকে থালার উপরে খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে। অন্নের মধ্যে ইহারা সাধুদিগের মাংস, এবং জলপাত্রে ইহারা সাধুদিগের রক্ত রাখে। ইহাদের চক্ষু হইতে সর্ব্বদাই প্রেম ধারা পড়ে। ইহারা কোন্ দেশী লোক?

ইহারা প্রেরিত মহাত্মা ঈশা, মুসা, সক্রেটিস্, শক্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করে। ইহারা কে? কাহার দল? ইহাদিগের বন্ধু কে? ইহাদিগের সহায় কে? ইহারা অন্ধকারে চাঁদ গেলে, চৌদ্দভুবন ধ্বংস হইলেও ইহারা আশমানেতে বানায় ঘর। আমরা চক্ষু খুলিয়া যেখানে কিছুই দেখিতে পাই না, ইহারা সেখানে যত সাধুদিগের চাঁদের হাট বসিয়াছে দেখিতে পায়। ভূতকালে ইহাদের ন্যায় লোক দেখিতে পাই না, বর্ত্তমান কালেও ইহাদিগের মত লোক দেখিতে পাই না। ইহারা আকাশের পানে তাকায় আর হাসে। ইহারা এমন ভাবে আপনাদিগের স্কন্ধের উপর হাত রাখে, অথবা বুকের উপর হাত বুলায় যেন কোন সাধুর চরণ ইহাদিগের স্কন্ধে ও বক্ষে স্থাপিত। ইহারা আকাশের প্রতি এরূপ ভাবে তাকায় যেন আকাশে ইহাদের স্বদেশী কোন আত্মীয় বন্ধু আছে। ইহাদিগের কাণও অদ্ভুত। যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ, যখন আমরা একটি শব্দও শুনিতে পাই না, ইহারা হাসিয়া বলে "আহা! স্বর্গের ভ্রাতৃমণ্ডলী কি সুমধুর সঙ্গীত শুনাইতেছেন।" ইহারা কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শুনিতে শুনিতে ইহারা ভাবে মত্ত হইয়া দৌড়িতেছে। এরা এক অদ্ভুত শ্রেণীর লোক। ভূত কালের লোক বলে, এরা আমাদের লোক নহে, বর্ত্তমান্ শতাব্দীর লোক বলে, এরা আমাদের লোক নহে। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বকালের আর্য্য যোগী ঋষিদিগের সঙ্গে মিলাইয়া দেখি, ইহাদের সঙ্গে তেমন মিল দেখিতে পাই না। বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া দেখি, ইহারা কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত, দেখি ইহারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। ইহারা পুরাতনও নহে নূতনও নহে, ইহারা কোন বিশেষ জাতিভুক্ত নহে। এরা এদেশের নয়, একালের নয়। ইহাদের বাড়ী বিদেশে, ইহারা অন্ততঃ পাঁচ সহস্র বৎসরের পরের লোক। ইহারা কয় জন অগ্রগামী হইয়া এদেশে আসিয়াছে, এরা উজন স্রোতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। এরা কি প্রকার বিপরীত গতিতে এখানে আসিয়াছে। নববিধানের লোকসম্পর্কে পৃথিবী বিস্ময়াপন্ন হইয়া এরূপ কত কথা বলিতেছে। হে ভবিষ্যতের পুত্রগণ, তোমাদিগকে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম বলি, কেন না

তোমরা যথার্থ নূতন রাজ্য হইতে আসিয়াছ। তোমরা প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চারি দলের মধ্যে কোন দলভুক্ত নহ। তোমাদের ভাষার বর্ণমালাও এখানে কেহ জানে না। তোমাদের স্বর্গীয় ভাষা, দেবভাষা সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিবার লোক এখানে কেহ নাই। তোমাদের নূতন ভাব এখানে কেহ বুঝিতে পারে না। ইংরাজী, বাঙ্গালা, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা ভিন্ন যে ভাষা আছে তাহা কেহ জানে না। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের শাস্ত্র বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেন, ভবিষ্যতের শাস্ত্র-বিজ্ঞান ইনি জানেন না। হে নববিধান, যখন তুমি আকাশের চন্দ্র, আকাশের পাখী এবং বাগানের গোলাপ ফুলের সঙ্গে কথোপকথন কর, তখন পৃথিবী কিরূপে তোমার ভাষা বুঝিবে এবং তোমাকে পাগল না বলিয়া আর কি বলিবে? পৃথিবীর লোক হাসিয়া বলে, ঐ যে বিধানবাদী ভক্ত, সে ভাতের সঙ্গে কথা কয় এবং বলে কি না ঈশা তাহার ভাতের ভিতরে আছেন। বাস্তবিক পাগল বিধানবাদীকে কে বুঝিবে? হে প্রাণাধিক হৃদয়ের ভাই নববিধান, তুমি কেন আপনাকে বৃথা বুঝাইতে চেষ্টা কর, তোমাকে কেহই এখন বুঝিবে না। তুমি হাতে হাতে ঈশ্বরকে যদি দেখাইয়া দেও তথাপি কেহ দেখিবে না। যাহার মনের ভিতরে প্রাণেশ্বরের অভ্যুদয় হয় নাই সে কিরূপে তোমার কথা বুঝিবে? যখন তুমি বল যে, ডাকযোগে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে পরলোক হইতে পত্র পাইয়াছি, তখন পৃথিবীর লোকে বলে এ ব্যক্তি পাগল। ডাক ঘরে বৈকুণ্ঠের চিঠী। হে নববিধান, বহু শতাব্দী পরে পৃথিবীতে তোমার বাড়ী একটু একটু দেখা দিবে। তোমার ঘর বাড়ী দেবলোকে। তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই বৈরাগী। এদেশস্থ নর নারীগণ তোমার ভাই ভগিনী নহে। যখন তোমার কথা তাহারা বুঝে না, তখন কিরূপে বলিবে যে তাহারা তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব। কিন্তু হে নববিধানের লোক সকল, তোমরা স্বর্গস্থ মহাজনের মাল লইয়া আসিয়াছ, তোমাদিগকে এখানে তাহা বিক্রীর চেষ্টা করিতে হইবে। ক্রমে তোমাদের দেশের লোক যাতায়াত করিলে পথ পরিষ্কার হইবে। তোমাদের কাজ তোমরা করিয়া যাও। তোমরা পৃথিবীর নীচ ব্যবহার শিখিও না। এখানকার লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলে, নীতি বলে

তাহার সঙ্গে তোমাদের নববিধানকে মিশ্রিত করিও না। তোমাদের আহার বস্ত্র ব্যবহার সমস্ত নববিধানের নূতন ভাব ধারণ করুক। নূতন বৎসর তোমাদের পক্ষে নূতন বৎসর হউক। খুব বৈরাগীর খেলা খেল। এস সকলে মিলিয়া বৈরাগ্যের খেলা খেলি। সেই ত পৃথিবীতে বহু শতাব্দী পরে হাজার হাজার লোক নববিধনবাদী হইবে। এই সময় হইতে সূত্রপাত করি। আগে আমাদিগকে স্বর্গরাজ এই বলিয়া পাঠাইলেন,—"যাও তোমরা দ্রুতবেগে গিয়া এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও সাগরের দ্বীপ সমূহকে এই পাঁচ খানি পত্র দাও এবং আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া সকলকে জাগ্রত হইতে বল। তোমরা পৃথিবীকে বল যে আমরা ভবিষ্যতের নব প্রদেশ হইতে আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞাতি বৈরাগী ভক্তগণ সকলে সেখানে। এ সকল কথা বল, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নববিধানের অদ্ভুত তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিবে। ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানকার লোকদের মধ্যে দল বাড়াইতে চেষ্টা কর। এই পৃথিবীর ভূমি তোমাদের নয়, এখানকার ভূমি, এখানকার বৎসর তোমাদের নহে। অতএব এখানকার কিছুতেই আসক্ত হইও না, এখানকার মায়াতে মুগ্ধ হইও না। আপনার দেশের লোককে এখানে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে আমোদ কর। লোকে তোমাদিগকে আদর করিল না বলিয়া নিরাশ হইও না, পৃথিবী পরে অনুতাপ করিয়া তোমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে এবং এই নববিধান সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে।"

দেহতত্ত্ব।

রবিবার ১৩ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক।

হে যোগী, তুমি যদি যোগ সাধন করিয়া থাক, তুমি যদি যোগ বুঝিয়া থাক, তবে তুমি কখনও শরীরের প্রতি অবহেলা করিতে পার না। যোগী যোগ বলে পৃথিবী ছাড়িয়া, শরীর ছাড়িয়া, ইন্দ্রিয়াতীত আত্মারাজ্যে প্রবেশ করেন সত্য, কিন্তু তথাপি শরীর তাঁহার পক্ষে অনাদরের বস্তু নহে। কেন না তিনি শরীরের মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেবতা ভগবানের আবি-

ৰ্ভাব অনুভব করেন। যোগী শরীরের মধ্যে থাকিয়াও সমুদয় অসার পার্থিব ব্যাপার অতিক্রম করিয়া অশরীরী পরমাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। যোগী শরীরকে অবহেলা করেন না। হিন্দুস্থানে প্রাচীন যোগিগণ দেহতত্ত্বজ্ঞ হইয়া রীতিপূর্ব্বক দেহ সাধন করিতেন। হে নববিধানের ব্রহ্মযোগী, ব্রহ্মসাধক, তুমি যদি তোমার আপনার শরীরের ভিতরে তোমার জীবিতেশ্বরকে না দেখিতে পাও, তবে তুমি প্রকৃত যোগী নহ। তোমার প্রাণের হরি তোমার বক্ষস্থলে যোগাসনে বসিয়া আছেন। প্রাণের প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ আমাদের জীবনের মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হে ভক্ত, তোমার বক্ষের নিম্নে জীবন রক্ষার দুইটি প্রধান যন্ত্র স্থিতি করিতেছে, দক্ষিণ দিকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র, আর বামে একটি রক্তসঞ্চালনের যন্ত্র। এই দুইটি যন্ত্রের, কিম্বা দুইটির মধ্যে একটির কার্য্যও যদি বন্ধ হয়, তবে ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত শারীরিক কার্য্য বন্ধ হইবে। হে যোগী, তুমি তোমার যে প্রাণ সিংহাসনে হরিকে বসাইবে, সেই সিংহাসনের নিম্নে তোমার বুকের মধ্যস্থ এই দুটি যন্ত্র দুইটি স্তম্ভস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই দুটি যন্ত্র তোমার প্রাণ রক্ষার প্রধান উপায়। তুমি যখন হাঁচ, তুমি যখন হাই তোল, তুমি জান না তুমি কি কর। সেইরূপ যখন তুমি উপাসনা কর, যখন তুমি ব্রহ্ম সাধন কর, তুমি জান না যে তোমার শরীরের কোন্ কোন্ যন্ত্র বিশেষরূপে তোমার সাহায্য করিতেছে। এ সকল যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন তুমি একটি নিঃশ্বাস ফেলিতে পার না, একটি কথা বলিতে পার না। ঈশ্বরের শক্তিতে তোমার শরীরে তালে তালে নিঃশ্বাস পড়িতেছে এবং রক্ত নাচিতেছে। প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শরীর হরি হরি বলিতেছে, তোমার নিঃশ্বাসবায়ু বন্ধ হইলে তোমার আর হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। যেমন তালে তালে নিঃশ্বাস পড়িতেছে ও রক্ত চলিতেছে, সেইরূপ তালে তালে যোগীর যোগ সাধন চলিতেছে। যে আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহাকে কিরূপ বিশ্বাসী যোগী অথবা জ্ঞানী বিজ্ঞানী বলিব? জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং যন্ত্রী হইয়া, ফুস্‌ফুস্ এবং রক্তাধার এই দুইটি যন্ত্র চালাইতেছেন। যেমন মনের জীবন সেইরূপ শরীরের জীবন

সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করে। অনন্ত জীবনস্বরূপ ঈশ্বর শরীর মন উভয়ের মূল শক্তি ইহা কোন জ্ঞানী যোগী অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন প্রাচীন আর্য্য ঋষির ন্যায় গভীর যোগ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বল "হে ঈশ্বর, তুমি আছ," ইহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাধনের উপযোগী নিঃশ্বাস এবং রক্তও একবাক্য হইয়া বলে "হে ঈশ্বর, তুমি আছ।" এই যে শরীর মনের সঙ্গে ঐক্য ইহাই এখনকার দেহতত্ত্ব। এই দেহতত্ত্ব নববিধানের যোগের সহায়। নিজের শরীরের মধ্যে এই দুইটি আশ্চর্য্য কলকে সহায় করিয়া তোমরা নববিধানের বিজ্ঞানযোগ সাধন কর। এই দুইটীর উপরে ঈশ্বরের চরণ স্থাপিত। এই দুয়ের ভিতর দিয়া তোমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি কর। এই দুইটি যোগমন্দিরে যাইবার পথ। কি রক্ত নদীর উপর দিয়া কি নিঃশ্বাস বায়ুর উপর দিয়া যে দিক্ দিয়া যাও সেই যোগেশ সেই প্রাণেশকে দেখিতে পাইবে। এক দিকে শোণিত সরোবরে ঈশ্বরের চরণকমলে গিয়া পৌঁছিবে, আর একদিকে নিঃশ্বাস বায়ুতে উড়িতে উড়িতে ঈশ্বরের পবিত্র যোগনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইবে। এক দিকে রক্তনদী আর এক দিকে নিঃশ্বাস-পবন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং রক্ত সঞ্চালন ভিন্ন যেমন শরীরের জীবন থাকে না, সেইরূপ প্রেমভক্তির রক্ত এবং পবিত্রতার বায়ু ভিন্ন আত্মার ধর্ম্মজীবন থাকে না। প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর স্বয়ংই আত্মার মধ্যে পুণ্যের নিঃশ্বাস এবং প্রেমের রক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। যেমন নিঃশ্বাস-বায়ু দ্বারা শরীরের রক্ত পরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের পুণ্য-নিঃশ্বাসে সাধকের হৃদয়ের প্রেমরক্ত বিশুদ্ধ হয়। অতএব হে ব্রহ্মসাধক, তুমি আপনার শরীর এবং মনের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর। তুমি বাহিরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়া প্রবঞ্চিত হইও না। "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর" বলিয়া তুমি বাহিরের দিকে তাকাইও না; কিন্তু ঈশ্বরকে তোমার প্রাণের মূলে, তোমার অন্তরতম স্থানে দর্শন কর। হে যোগ-শিক্ষার্থী, যখন তুমি উপাসনা আরম্ভ কর, তখন তোমার নিজের বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া জিজ্ঞাসা করিও "হে নিঃশ্বাসযন্ত্র, হে রক্তযন্ত্র, তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেও, তোমাদের মধ্যে একটি ঈশ্বরের প্রেমের নদী আর একটি তাঁহার পুণ্যের উৎস। তোমরা জীবের জীবনরক্ষার যন্ত্র,

অতএব তোমরা তোমাদের প্রাণেশ্বরী জননীকে দেখাইয়া দেও। তোমরা অন্তরতম প্রাণস্থ ঈশ্বরকে প্রকাশ করিয়া সুখের উপাসনার পথ দেখাইয়া দেও। যাহারা আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করে তাহারাই প্রকৃত মধুর ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র এবং রক্তাধার যন্ত্র সহায় হইয়া যখন সাধকের নিকট স্বীয় দেহস্থিত ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়, তখন সাধক শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই দুটি যন্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লেখা পাঠ করেন। দুঃখী তাহারা তোমাদের মধ্যে যাহারা এখন পর্য্যন্ত এই দুইটি যন্ত্র পড়িল না। তোমরা আপনার বুকের উপর হাত দিয়া দেহের মধ্যে যে ব্রহ্মমন্দির আছে তাহা দেখিলে না। বক্ষে হস্ত রাখিয়া বল দেখি, "হরি হে এ দেহে আছ সদা বর্ত্তমান, নিঃশ্বাসে শোণিতাধারে করে তোমার নাম গান।" কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে হইবে না, কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ বিশ্বাসী যোগী হইয়া আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে ঈশ্বরের জলন্ত সত্তা উপলব্ধি করিয়া "সত্যং" অথবা "হে ঈশ্বর তুমি আছ," এই কথা উচ্চারণ করিতে হইবে। হে সাধক, তোমার নিজের রক্তনদীর মধ্যে প্রেমের জল, দয়ার জল রহিয়াছে, যত দিন না তুমি সেই জলে স্নান করিয়া ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিবে, তত দিন তোমার উপাসনা উচ্চ শ্রেণীর মিষ্ট উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিব না। তোমার উপাসনা এখনও অতি নীচ প্রকার। উচ্চ উপাসনার তুমি অধিকারী হও নাই। যখন তোমার উপাসনার প্রত্যেক কথা একবার রক্তে ডুবিবে, আবার নিঃশ্বাসে উড়িবে, অর্থাৎ কি নিঃশ্বাসপথে কি রক্তনদীর পথে, উভয় পথেই তুমি জীবন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবে, তখন জানিব তুমি উচ্চ শ্রেণীর উপাসক। এই দুই পথ আজ পর্য্যন্ত অনেকেই আবিষ্কার করে নাই। যিনি এই দুই পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি অতি সহজে স্বর্গে গমন করেন। তিনি আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিতে পান। বাস্তবিক রক্তনদীর একটী একটী ঢেউ ব্রহ্মপাদস্পর্শ করিয়া চলিতেছে। ভক্ত বলেন "রক্ত, তুমি ব্রহ্মপদ ধৌত করিতে করিতে চল, নিঃশ্বাস, তুমি ব্রহ্মকে পক্ষে লইয়া উড়।" ভক্ত আপনার

ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের ভিতরে, আপনার রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়ার মধ্যে হরির শব্দ শ্রবণ করেন। তিনি আপনার রক্তের বেগের মধ্যে ঈশ্বরের দয়ার বেগ দেখিতে পান। ঈশ্বরের দয়া নিঃশ্বাস ও রক্তরূপ ধারণ করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের শক্তি আমাদিগের শরীরে রক্ত সঞ্চালন করিতেছে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু প্রবাহিত করিতেছে। তিনি যদি শক্তি কাড়িয়া লন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। হরিশক্তি বিনা একটি নিঃশ্বাস পড়ে না, এক ফোটা রক্ত চলে না। হে জীবমীন, তুমি হরিকে অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে? তুমি হরিবারি ভিন্ন থাকিতে পার না। তোমার নিঃশ্বাসে হরি, তোমার রক্তে হরি, তোমার অন্তরে হরি, তোমার বাহিরে হরি। অতএব তুমি কদাচ হরিকে ছাড়িয়া থাকিতে চেষ্টা করিও না। হরি আপনার সত্তাজালে তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তোমার সাধ্য নাই যে তুমি হরি হইতে বিচ্ছিন্ন হও। মূঢ় জীবাত্মা বলিয়াছিল "আমি কোথাও মাকে দেখিতে পাই না।" এই জন্য বিশ্বাস ও বিজ্ঞান একত্র হইয়া তাহার নিজের শরীরের নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে তাহার মাকে দেখাইয়া দিয়া তাহাকে শাস্তি দিল। ভক্ত ভক্তিনয়ন খুলিয়া আপনার নির্ম্মল রক্তসরোবরের মধ্যে হরিচরণ কমল ভাসিতেছে দেখিতে পান। তিনি আপনার বুকের রক্তের মধ্যে মার পাদপদ্ম দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। তিনি দেখিতে পান তাঁহার মা লক্ষ্মী এক দিকে যেমন নিঃশ্বাসবায়ুতে উড়িতেছেন, তেমনি আবার আর এক দিকে তাঁহার রক্তনদীতে খেলা করিতেছেন। বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী ভক্তের শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া তাহা দ্বারা আপনার পবিত্র অভিপ্রায় সকল সম্পাদন করিতেছেন। এই যে মনুষ্য শরীর ইহা ভগবানের একটি অদ্ভুত কল। ইহার ভিতরে হরি আপনি মন্ত্রী হইয়া কত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। হে সাধক, যখন তুমি আপনার শরীর স্পর্শ কর তখন তোমার জানা উচিত যে তুমি ব্রহ্ম-নিকেতন স্পর্শ করিতেছ। এই দেহতত্ত্ব জানিলে ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি এবং যোগীর যোগ বৃদ্ধি হয়। আপনার দেহের মধ্যে হরিকে দেখিয়া ভক্ত ভক্তির অশ্রু বর্ষণ করেন। যেমন

শরীরের ভিতরে নিঃশ্বাস ও রক্তের দুইটি চমৎকার ভৌতিক কল রহিয়াছে, আত্মার মধ্যেও ঠিক ইহার অনুরূপ দুইটি অধ্যাত্ম কল রহিয়াছে। যত দেখিবে নিঃশ্বাস, তত বাড়িবে বিশ্বাস, যত দেখিবে রক্ত, তত হইবে ভক্ত। মা লক্ষ্মী পবিত্রতার বায়ু হইয়া এক দিকে খুব উচ্চ পর্ব্বতের উপরে উড়িতেছেন, আবার আর এক দিকে রক্তের মধ্যে শক্তিরূপে বাস করিতেছেন। জগজ্জননীর শক্তিতে আমরা অবস্থিতি করিতেছি, বিচরণ করিতেছি, জীবন ধারণ করিতেছি। জননীর বক্ষে আমরা জীবিত রহিয়াছি। মার নিঃশ্বাসে আমরা জীবিত, মার রক্তেতে আমরা জীবিত। মার শক্তি ছাড়া আমার কিছুই নাই। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই মার শক্তি দেখিতে পাই। অতএব আপনার বুকের ভিতরে সর্ব্বত্র মাকে অন্বেষণ কর। আপনার রক্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে স্বর্গের জননীকে দর্শন কর। নিঃশ্বাস এবং রক্তযন্ত্ররূপ দুইটি আর্গান বাজাও, যতই বাজাইবে তত ইহারা মধুরস্বরে হরিগুণ কীর্ত্তন করিবে। যেমন প্রস্রবণ হইতে ক্রমাগত জল ঝরে, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিময়ী জননীর স্নেহ প্রস্রবণ হইতে জীবের দেহ মনের মধ্যে ক্রমাগত শক্তি, সামর্থ্য নিঃসৃত হইতেছে। সেই জননীর স্নেহই নিঃশ্বাসরূপে রক্তরূপে, জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও শান্তিরূপে আমাদিগের দেহ মনকে পরিপূর্ণ করিতেছে। যেমন শরীরের মধ্যে নিঃশ্বাস বায়ুরক্তের ময়লা কাটিয়া রক্তকে পরিষ্কৃত করে, সেইরূপ আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র নিঃশ্বাস জীবের বিকৃত হৃদয়কে সংশোধন করে। ঈশ্বরের পুণ্য সমীরণে জীবের প্রেমরক্ত পরিষ্কৃত হয়। ঈশ্বরের শক্তি হইতে ক্রমাগত পুণ্যের বাতাস আসিয়া সাধকের মনের সমস্ত জঞ্জাল দূর করে। আধ্যাত্মিক শরীরে ক্রমাগত যোগের বাতাস বহিতেছে, ভক্তিনদী চলিতেছে। হে নববিধানের ভক্ত, তুমি বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখ তোমার হৃদয়ের মধ্যে গৌরাঙ্গের ভক্তিনদী চলিতেছে, ঈশা শাক্যের পবিত্র নিঃশ্বাস পড়িতেছে। যেমন তোমার নিঃশ্বাস পড়িতেছে, এবং তোমার রক্তের ঢেউ উঠিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর তাঁহার সাধুভক্তদিগকে লইয়া তোমার দেহমন্দিরে লীলা করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন। প্রতি নিঃশ্বাসে ও প্রত্যেক রক্তের তরঙ্গের

সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করিয়া নিঃশ্বাস ও রক্ত হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সমস্ত পাপাসুরকে তাড়াইয়া জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হইলাম, ভাগবতী তনু লাভ করিলাম। হে জীব, এই রূপে দেহ মধ্যে ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলে তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে।

ব্রহ্মপ্রেম চির-সরস।

রবিবার ১৮ আষাঢ় ১৭৯৯ শক।

যদি পৌত্তলিক হইতে হয় তবে রাঙ্গা চরণ মানিতেই হইবে। দেবতার চরণ রাঙ্গা নয় যে বলে সে পৌত্তলিক নহে। যদি পুতুল পূজা করিতে হয় তবে তাঁহার রাঙ্গা চরণ পূজা করিলে তৃপ্তি আছে। তাপিত প্রাণকে শীতল করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য, এই জন্য পৌত্তলিক স্বর্গীয় দেবতার চরণে রাঙ্গা বর্ণ দেয়। যদি অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম হইতে চাও তথাপি ঈশ্বরের নিরাকার শ্রীচরণকে সুধারসে অভিষিক্ত করিতে হইবে। যদি হৃদয়ে অনুভব শক্তি থাকে, তবে বলিবে দয়াল প্রভুর যে চরণে আমাদের মস্তক লুণ্ঠিত সেই চরণ শুষ্ক নহে, তাহা প্রেমে রাঙ্গা হইয়াছে। প্রভুর চরণ যে শুষ্ক বলিল সে আর ব্রাহ্ম রহিল না। ভক্তি চক্ষে এমন চরণ দেখিব যাহা হইতে অবিরত কৃপা ও আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা ঐ চরণের রূপ, কান্তি, সৌন্দর্য্য ভাবিয়াছেন তাঁহারা পাগল হইয়াছেন। ভক্তেরা ঈশ্বরের প্রেমানুরঞ্জিত চরণের শোভা দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আর ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইতে পারেন না, এই জন্য ভক্তি শাস্ত্রে মুখের বর্ণনা নাই। সমস্ত দেশকে ডাকিয়া তাহার গলায় অমূল্য রত্নহার দিয়া যাইতে পারিব যদি নিরাকার চরণ বক্ষে ধারণ করিতে পারি। "দাঁড়াও একবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে, লুটাইযে পদতলে সফল করি জীবন।" যিনি এই সকল কথা বলিতে পারেন, তিনি জানেন ঈশ্বরের চরণ কেমন সুধাময়। "পিতা, পাপীর বক্ষে তোমার শীতল চরণ স্থাপিত কর," এই কথায় কত আরাম। এই চরণ কথার কেমন মধুর প্রভাব। চরণ কথা কে বাহির

করিল? ঐ চরণের ছায়া লাভ করিয়া যে শীতল হইয়াছে, ঐ চরণের আশ্রয়ে যে নির্ভয় হইয়াছে, ঐ চরণের সৌন্দর্য্যে যাহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে, সে তাহার বুকে হাত দিয়া দেখিয়াছে তাহার বুকের মধ্যে একটী স্থানে ঐ চরণরূপ সহস্র ফুল ফুটিয়াছে। ব্রহ্মপদসংস্পর্শে বহুকালের দগ্ধ প্রাণ শীতল হইয়াছে। "ভক্ত পড়িয়াছেন দেবতার চরণতলে" এই কথাটী এত মনোহর যে এই কথাটী শুনিয়া কত লোক সর্ব্বস্ব ছাড়িল। তাহারা বলিল, আমরা এই এক কথা হইতে লক্ষ টাকা বাহির করিব। যখন চরণ কথা শুনিয়া মনুষ্যের এত ভক্তি হইল, তখন ঈশ্বরের মুখশ্রী দেখিলে ভক্তের মন কত প্রমত্ত হইবে তাহা ভাবিতে পারা যায় না। 'ক' অক্ষর দর্শন করিতে না করিতেই প্রহ্লাদদিগের, শিশুদিগের এত আহ্লাদ হইল। কিন্তু এমন আহ্লাদের স্রোত এত শীঘ্র বন্ধ হইল কেন? পরিচিত অপরিচিত সমুদয় ভাই ভগিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই 'ক' অক্ষর বাহির হইতে না হইতেই সুধাভোগ বন্ধ হয় কেন? প্রথম অন্ন ব্যঞ্জন পাইতে না পাইতে তোমরা উঠিয়া যাও কেন? প্রেমের ভোজে বসিয়াছ, প্রাণ ভরিয়া পুণ্য শান্তি ভোজন কর, যত পার মহোৎসবের আনন্দ আহার কর। মহোৎসব শেষ না হইতে উঠিয়া যাইও না। তোমাদের হাত ধরিয়া বলি, তোমরা এমন অসৎ দৃষ্টান্ত দেখাইও না। জননী অন্ন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তোমরা উঠিয়া গেলে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে। ঐ দেখ, তোমাদের সমক্ষে দুই শত পাঁচ শত লোক উঠিয়া গেল, সাবধান কেহ যেন উঠিয়া না যান। সব অনুরোধ রক্ষা কর। জগতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য জগজ্জননী নিজ হাতে করিয়া সুধা পরিবেশন করিতেছেন, তোমরা ইহার প্রতিবন্ধক হইও না। যদি বলিতে পারিতে, মা সন্তানদিগের দুঃখ দেখিয়া উপাসনারূপ যে সুধা বিলাইতেছেন, তাহাতে মিষ্টতা নাই, উপাসনা একটী শুষ্ক ব্যাপার, তাহা হইলে তোমাদিগকে এই অনুরোধ করিতাম না। যখন ঈশ্বরের চরণের কথা শুনিয়াই প্রকাণ্ড বীরেরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যায়, তখন পিতার স্বর্গে আরও কত বড় বড় অস্ত্র আছে। ভিতরে থাকিয়া কে বলিতেছেন আরও এক বার সময় হইবে। আর এক বার স্নেহময়ী জননী আসিবেন। এই কথা শুনিয়া অবধি মনে

বড় আশা হইয়াছে। আবার এই দেশে পবিত্র উৎসাহানল জ্বলিয়া উঠিবে। ঈশ্বরের প্রেমেতে লোক মাতিবে। তোমাদের পদানত হইয়া ভিক্ষা চাহিতেছি, এই কথা অবিশ্বাস করিও না। সেনাপতি জয়পতাকা উড়াইবেন, অন্ধকার দেশে আবার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে। অধর্ম্মের রজনী অবসানে ধর্ম্মের সুপ্রভাত হইবে। শত্রুদল চূর্ণ প্রায়, সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য আগতপ্রায়। প্রেমিক ব্রাহ্মগণ এই পৃথিবীতে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রাণ মোহিত হইয়া যায় তাহা কি বস্তু কেহ কি বুঝাইয়া দিতে পার? ভালবাসিয়া মরিয়া যাইব। শত্রুকে ভালবাস, পৃথিবীকে ভালবাস। মনে আছেত সে সকল মহাত্মাদের নাম যাঁহারা পৃথিবীর কল্যাণের নিমিত্ত আপনাদের প্রাণ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহারা পৃথিবীকে সোণার মুকুট পরিধান করাইয়া আপনারা কাঁটার মুকুট পরিতেন, পৃথিবীর লোককে সাল পরাইয়া আপনারা ছেঁড়া কাঁথা পরিয়া গাছতলায় থাকিতেন। তাঁহারা রাস্তায় রাস্তায় দয়াল নাম গাইয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা সকলেই প্রেমের মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের নাম শুনিলেও আশা হয়। এস আমরাও প্রেমের মানুষ হই। আমরা এখনও কেবল প্রেমের 'ক, খ' শিখিতেছি। প্রেমের পূর্ণ প্রস্ফুটিত ভাব কবে হইবে জানি না, কিন্তু কেহই নিরাশ হইও না, স্বর্গের জননী স্বয়ং প্রেমান্ন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, মা ভাণ্ডার হইতে প্রেমসুধা লইয়া আসিলেন বলে। যখন সেই সুধা পান করিব, তখন অপ্রেম অশান্তি একেবারে পলায়ন করিবে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা সকলকে ভালবাস, স্বর্গের প্রেমে তোমরা সুখী হইবে এবং দেশ বেঁচে যাবে। মার পরিবেশন কেবল আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের হয়েছে কি? এই প্রথম পূজা আরম্ভ হইয়াছে। এখনও ব্রহ্মপূজার প্রথম বর্ণও ভালরূপে প্রকাশ হয় নাই। ব্রহ্ম পূজা করিয়া জগৎ উদ্ধার হইবে। একটি লোকও মরিবে না। সকলেই বাঁচিয়া যাইবে, প্রতি জনেই পৃথিবী হইতে অনন্ত কালের ধন লইয়া যাইবে।

পাপাসুর জয়।

রবিবার ২০ শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক।

পাপ কি এ সম্বন্ধে মানুষের অনেক ভ্রম আছে। অধর্ম্ম কি? অন্যায় কি? অশুদ্ধ কাহাকে বলে? ইহা অনেকে বুঝিতে পারে না। যাহা বাহিরে করি তাহা পাপ নহে, যাহা মুখে বলি তাহা পাপ নহে। হস্ত অথবা রসনা পাপের আলয় নহে। পাপ বাহিরে নহে, পাপ অন্তরে। আবার যাহা ভাবিয়াছি, যাহা চিন্তা করিয়াছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা অভ্যাস হইয়াছে, তাহাও পাপ নহে। যাহা এত দিন পাপ মনে করিয়াছি, তাহা পাপ নহে। এ জীবনে যে কয়েকটী মিথ্যা বলিয়াছি যে কয়েকটী নরহত্যা করিয়াছি তাহা পাপ নহে। মনের চিন্তাতে, কি আলোচনাতে, কি অভ্যাসেতে পাপ নাই। তবে পাপ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যে কোন ইচ্ছা পোষণ করিতে পারি, ইহাই আমার প্রকৃত পাপ। এই যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা ইহাই পাপের মূল। যে পাপ করিয়াছি তাহা ছোট, যাহা করিতে পারি তাহা বড়। হে মহাপাপী, তুমি নরহত্যা প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তোমার পাপ করিবার ক্ষমতার নিকটে সে সকল শর্ষপ কণার ন্যায় ক্ষুদ্র। অনুতপ্ত পাপী, তুমি অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছ—"এই দেখ আমার জীবনের অমুক অমুক স্থানে এই এই ভয়ানক জঘন্য পাপের ক্ষত সকল রহিয়াছে।" সত্য বটে তোমার গত পাপ সকল ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়, কিন্তু এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার মনের মধ্যে যে পাপের মূল রহিয়াছে তাহা হইতে আরও কত ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাপ বৃক্ষ সকল জন্মিতে পারে। তুমি এক বার ভাবিয়া দেখ, পবিত্রতা এবং বৈরাগ্য বিরুদ্ধ তুমি কত কত রাশি রাশি বিলাসসুখ কামনা করিতে পার; ক্ষমাগুণের বিরুদ্ধ সামান্য কারণে কিংবা প্রবল শত্রুদিগের উত্তেজনায় কত রাগ প্রকাশ করিতে পার এবং তাহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসা করিতে পার, লোভ পরবশ হইয়া অন্যায়রূপে প্রবঞ্চনা করিয়া কত লোকের

নিকট হইতে টাকা লইতে পার, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে কত বড় এবং পৃথিবীকে কত ছোট মনে করিতে পার, এবং পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষানলে কত জ্বলিতে পার। বাস্তবিক তুমি ইচ্ছা করিলে যেরূপ ভয়ানক পাপ করিতে পার, তাহার তুলনায় তুমি যে সকল গুরুতর পাপ করিয়াছ তাহা কিছুই নহে। তুমি সুবিধা পাইয়া পাঁচ বার নিষিদ্ধ আমোদ প্রমোদ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তুমি পাঁচ শত বার সেই নিষিদ্ধ অপবিত্র সুখ ভোগ করিতে পার। গত জীবনে লোভী হইয়া পাঁচটী টাকা চুরী করিয়াছ, ভবিষ্যতে তুমি পাঁচ শত টাকা চুরী করিতে পার। গত জীবনে প্রতিহিংসা ও ক্রোধে অন্ধ ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া একটী নরহত্যা করিয়াছ, ভবিষ্যতে রাগে মত্ত হইয়া শত শত লোকের মস্তক ছেদন করিতে পার। তোমার মনের ভিতরে পাপ ধ্যান করিবার লালসা আছে কি না বল। তোমার প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না বল। টাকা দেখিলে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তোমার হস্ত চুলকায় কি না? লোভের সামগ্রী সকল দেখিলে তোমার মুখ হইতে জল পড়ে কি না? যদি তুমি এ প্রকার স্থানে থাক যেখানে তুমি অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা চুরী করিতে পার, সেখানে তুমি প্রলুব্ধ হস্ত প্রসারণ করিতে পার কি না? যদি পার, যদি সুবিধা পাইলে তোমার চুরী করিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তুমি যে লোভী এবং প্রচ্ছন্ন চোর তাহা প্রমাণিত হইল। তোমার বন্ধুর অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় তুমি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পার, তবে প্রমাণিত হইল তোমার ভিতরে অসত্য আছে। মনে কর, এক জন তোমার নামে অপবাদ রটনা করিয়াছে, এক জন তোমাকে কটূ বলিয়াছে, এক জন তোমাকে কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে, এক জন গলা টিপিয়া তোমার ছেলেকে বধ করিয়াছে, এক জন তোমার স্ত্রীর অপমান করিয়াছে, এ সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কি তোমার অন্তরে ভয়ানক প্রতিহিংসা এবং রাগ উত্তেজিত হয় না, এ সকল লোককে স্মরণ করিবামাত্র কি তোমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রক্ত গরম হইয়া উঠে না? যদি হয় তবে সিদ্ধান্ত হইল যে তুমি ক্ষমাশীল নহ, তুমি প্রতিহিংসা দোষে দোষী। কেহ তোমার অপ-

কার করিলে তুমি যদি তাহার অনিষ্ট ইচ্ছা করিতে পার, কেহ তোমার স্ত্রীর নিন্দা করিলে, তুমি যদি তাহার স্ত্রীর অধোগতি কামনা করিতে পার, কেহ তোমার সন্তানদিগকে বিপদগ্রস্ত করিলে, তুমি যদি তাহার সন্তানদিগের মৃত্যু ইচ্ছা করিতে পার, তবে জানিবে তুমি ক্ষমাবিবর্জ্জিত, তোমার মনে প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল, তোমার মনের ভিতরে রাগের নরক প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যাহাদিগকে তুমি পছন্দ কর না যদি তাহাদিগের সুখ তুমি সহ্য করিতে না পার, তাহাদিগের গাড়ী ঘোড়া দেখিলে, তাহাদিগের সন্তানের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিলে, যদি তোমার মনে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তুমি জানিবে তোমার মনের ভিতরে চাপা ঈর্ষানল রহিয়াছে। হে সাধক, তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার তোমার টাকার অহঙ্কার নাই, বিদ্যার অহঙ্কার নাই, কিন্তু তোমার কি ধর্ম্মের অহঙ্কার নাই? যখন তুমি কাঙ্গালের বেশে একতারা হাতে করিয়া পথে পথে, দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও তখন যদি লোকে তোমাকে চৈতন্যের ন্যায় ভক্ত বৈরাগী বলে, তখন কি তোমার মনে একটু ধর্ম্মের উচ্চ অহঙ্কার উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই? যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে জানিবে তোমার অহঙ্কার আছে এবং সে অহঙ্কার বিদ্যা ও ধনের অহঙ্কার অপেক্ষাও জঘন্য। কেন না ধার্ম্মিক হইয়াও যে অহঙ্কারী হয় সে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। নতুবা ভিতরেও গরল? অহঙ্কার বিনাশ করিতে গিয়াও অহঙ্কার? এইরূপে বিচার করিয়া দেখিবে যদি ষড় রিপুসম্পর্কে তোমার প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তবে জানিবে তোমার মনের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা সম্বন্ধে পাপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে যত পাপ করিতে পারে তাহার তত পাপ আছে, মনে করা উচিত। কেন না পাপ করিবার যত সম্ভাবনা তাহা পাপের পরিমাণ। হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি যদি বলিতে পার যে, তোমার জীবনে ব্রহ্মকৃপায় এত দূর পাপ জয় হইয়াছে যে তোমার আর পাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, তবে তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে, তুমি পাপের অতীত হইয়াছ। যদি তুমি সৎসাহসের সহিত বলিতে পার যে তোমার মন এতদূর শুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়াছে যে কোন

প্রকার প্রলোভন তোমাকে বিচলিত করিতে পারবে না, তুমি এত দূর ক্ষমাশীল যে শত্রুদিগের ভয়ানক উৎপীড়নেও তোমার ক্রোধ উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই? তুমি এত দূর নির্লোভী যে কোটি কোটি টাকাও তোমার লোভ উদ্দীপন করিতে পারে না, তুমি এত দূর বিনয়ী যে কিছুতেই তোমাকে অহঙ্কারী করিতে পারে না, এবং তুমি এমনই প্রেমিক যে যতই তুমি পরশ্রী দর্শন কর ততই তোমার অন্তরে আহ্লাদ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তুমি জানিবে যে ঈশ্বরের কৃপাতে তুমি রাগ লোভ অহঙ্কার ও ঈর্ষার অতীত হইয়াছ। তুমি কল্পনা দ্বারা এক বার সমস্ত পাপ ভাব। প্রলোভনে পড়িলে তুমি কত প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ করিতে পার, শত্রুর প্রতি কত নির্যাতন করিতে পার, পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া কত অর্থ সংগ্রহ করিতে পার, অনাথ পিতৃমাতৃহীন শিশু এবং বিধবার দুঃখের প্রতি কত উপেক্ষা করিতে পার, অহঙ্কারী হইয়া অপরকে কত নীচ ও হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতে পার, পরশ্রী দেখিয়া কত কাতর হইতে পার, কঠোর স্বার্থপর হইয়া নিরাশ্রয় দুঃখীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আপনার ধন সম্পদ কত বৃদ্ধি করিতে পার, এ সমস্ত এবং অন্যান্য যত প্রকার পাপাচরণ করিবার তোমার সম্ভাবনা আছে তাহা এক বার কল্পনা দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ। যদি শাক্যসিংহ এবং মহর্ষি ঈশার ন্যায় সমস্ত পাপ প্রলোভনের ঘনীভূত আকরস্বরূপ সয়তানকে একেবারে বিদায় করিয়া দিতে পার, তবে তোমার ভয় নাই। কথিত আছে, প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর শাক্য সিংহকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার জন্য অসুর মার তাহার সমক্ষে নানা প্রকার প্রলোভন উপস্থিত করিয়াছিল। শাক্যসিংহ দুর্জ্জয় ধর্ম্মবল এবং মহাতেজ প্রকাশ করিয়া সেই অসুরকে পরাস্ত করিলেন। কথিত আছে মার আপনার প্রলোভনদল সঙ্গে লইয়া বুদ্ধদেবের কাছে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল,—"হে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, দেখ তোমার কঠোর বৈরাগ্যে তোমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার মুখ বিবর্ণ, চল সংসারে, সেখানে তোমাকে নানাপ্রকার বিলাস সুখ দিব।' মারের এ সকল কথা শুনিয়া বুদ্ধদেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "তুই দূর হ।" লিখিত আছে দানব সয়তান মহর্ষি ঈশাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া-

ছিল, দুষ্ট সয়তান তাঁহাকে বলিয়াছিল "তুমি যদি ঈশ্বরার্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজনা কর, তবে তোমাকে এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা করিয়া দিব।" সয়তান তাঁহাকে এইরূপ অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল; কিন্তু ঈশা প্রবল পরাক্রমের সহিত বলিলেন, "সয়তান্ তুই দূর হ।" শাক্যসিংহের মার-দমন এবং মহর্ষি ঈশার সয়তান জয়, এ দুটি গল্প নহে। যদিও মার অথবা সয়তান নামে কোন দৈত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তথাপি এই দুটি গল্পের মধ্যে মনুষ্য-স্বভাবের একটি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মারের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ—ইহার অর্থ কি? মার কি? সয়তান কি? প্রলোভন। সুতরাং প্রলোভন জয় করাই সয়তান জয়। প্রত্যেক স্বর্গ যাত্রীকে এই সয়তান বধ অর্থাৎ প্রলোভন জয় করিতে হইবে। সয়তান অথবা মার বাহিরের কোন দানব নহে, ইহা মনুষ্যের মনের কল্পনা। মহাবীর শাক্যসিংহ এবং মহর্ষি ঈশা দুই জনেই বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার সময় সম্পূর্ণরূপে এই প্রলোভন জয় করিয়াছিলেন। পাপ প্রলোভনময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবার সময় কল্পনা ইহাঁদের উভয়ের নিকটেই সমুদয় পাপকে একত্র করিয়া একটি ভীষণাকার গঠন করিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। শাক্য সিংহের সেই গম্ভীর প্রশান্ত নয়ন সেই কল্পিত মার ও তাহার অনুচর প্রলোভন সকল দর্শন করিল, মহর্ষি ঈশার যোগনেত্র সেই ভীষণাকার সয়তানকে দর্শন করিল। উভয়েই আপন আপন অন্তরস্থ স্বর্গীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে সেই কল্পিত দৈত্য দ্বয়কে বিনাশ করিলেন। এই দুই প্রধান বৈরাগীর জীবনে এতৎসম্বন্ধে কেমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। ঈশার কত কাল পূর্ব্বে শাক্যসিংহ রিপু সংহার করিয়াছিলেন। প্রলোভন জয় না করিলে কেহই স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারে না। শাক্যসিংহ এবং ঈশা উভয়েই পৃথিবীকে দেখাইলেন কিরূপ স্বর্গীয় সাহসের সহিত প্রলোভন জয় করিতে হয়। অতএব হে সাধক, তুমি কি কি পাপ করিয়াছ তাহা ভাবিবে না। কিন্তু তুমি কত পরিমাণে এবং কি কি পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য বশতঃ ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা বশতঃ কত পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া

দেখ। তোমার মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তোমার কি কি প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখ; অর্থাৎ যত প্রকার পাপ প্রলোভন তোমার পক্ষে সম্ভব সমুদয়কে কল্পনা দ্বারা সংযোগ করিয়া একটি ভয়ানক আকার দিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত কর। যখনই দেখিবে তোমার সম্মুখে একটি বিকটাকার দৈত্য দাঁড়াইল, তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার করিয়া তাহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইবে। বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া এমনই দুর্জ্জয় পরাক্রমের সহিত হুঙ্কার করিবে যে তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য কাঁপিবে এবং পর্ব্বত সকল কড় কড় করিয়া উঠিবে। মহাতেজের সহিত বলিবে "রে পাপ সয়তান, তুই দূর হইয়া চলিয়া যা।" মহর্ষি ঈশা কেমন ভয়ানক জোরের সহিত এই কথা বলিয়া সয়তানকে দূর করিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি যে জোরের সহিত বলিলেন আমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র অল্পবিশ্বাসীর সমবেত স্বরও সেরূপ সতেজ হয় না। সয়তান আমাদের দুর্ব্বল স্বর বুঝিতে পারে, এই জন্য সয়তান আমাদের নিস্তেজ কথায় চলিয়া না গিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ঈশার স্বর শুনিবা মাত্র সয়তান পলায়ন করে; কিন্তু আমরা যদি দুর্ব্বল স্বরে শত শত বার সয়তানকে বলি, "তুই দূর হ" সয়তান আমাদের কথা গ্রাহ্য করে না, বরং কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। ঈশার এক কথাতে, এক বাণ নিক্ষেপে সয়তান প্রাণত্যাগ করিল, আর কখনও ঈশার কাছে গেল না। শাক্যসিংহ এবং ঈশার হৃদয়স্থ বৈরাগ্যানলে মার এবং সয়তান ক্ষণকালের মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল। বাস্তবিক ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া হুঙ্কার না করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি একেবারে উন্মূলিত হয় না। যিনি মৃত্যুকে বধ করেন, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের তেজে তেজস্বী না হইলে কেহই শমন এবং সয়তানকে সংহার করিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মতেজোবলে এক বার সয়তানকে সংহার করেন, তাঁহার জীবনে আর সয়তানের দৌরাত্ম্য সম্ভব নহে। অতএব জ্বলন্ত বৈরাগ্য ভিন্ন পাপদৈত্য দগ্ধ হয় না; বাহ্যিক বৈরাগ্যে কিছুই হয় না। কেবল কমণ্ডলু ও গৈরিক বস্ত্র ও উপবাসে কি নরকাগ্নি নির্ব্বাণ হয়? জোরের সহিত, ব্রহ্মতেজের সহিত বলিতে হইবে "রে সয়তান, তুই দূর হ। তোকে এখনই মারিব।"

ধর্ম্মযোদ্ধার বল দেখাইতে হইবে। সয়তান যোদ্ধার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিবে "মহাপ্রভু, ভ্রমবশতঃ, আপনার নিকটে আসিয়াছি, আর কদাচ আপনার নিকটে আসিব না। আমাকে ছাড়িয়া দিন।" হে নববিধানাশ্রিত ব্রহ্মভক্ত, তুমি ধর্ম্মবীরের ন্যায় সাহস করিয়া বল, "ঈশ্বর আমার সহায় হউন, এই আমি সয়তানের বুকের উপর পা রাখিলাম, আর আমি মন্দ লোক হইব না, আর আমি পাপ করিব না।" যাঁহার মনে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিতেছে তিনি কেন সয়তানকে ভয় করিবেন? প্রকাণ্ড ভীষণাকার সয়তান তাঁহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র কীটস্বরূপ। তিনি বলেন, "সয়তান, এটা কি? একটা সামান্য ক্ষুদ্র পোকা, টিপিব আর মরিবে, ফুঁ দিব আর উড়িয়া যাইবে।" ঈশা ফুঁদিয়া বলিলেন, "সয়তান, দূর হ।" আর সয়তান চলিয়া গেল। ঈশার ধর্ম্মবল, এবং সৎসাহস দেখিয়া পাপ সয়তান আত্ম হত্যা করিল। আমরা বলি আমাদের বল নাই তাই সয়তান আমাদিগকে ছাড়ে না। সয়তান বলে শাক্য ও ঈশার তীব্র বাক্যবানে আমি বিদ্ধ হইয়াছি, আমার আর সাধ্য নাই, সাহস নাই যে আমি তাঁহাদের নিকট যাইতে পারি। নববিধানের লোকেরা যদি সেই রূপ বলিতে পারেন তবে কি আর সয়তান তাঁহাদিগের নিকট আসিতে পারে? অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহা পুরাতন বিধি। ইহাতে কেবল অনুষ্ঠিত বিগত পাপ বিনাশ হয় কিন্তু ভাবী পাপের বারণ হয় না। নূতন বিধিতে পাপরোগের ঔষধ সৎসাহস। যে সকল পাপ হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রলোভন আসিতে পারে, সমক্ষে যে সকল ভয়ানক দুর্দ্দান্ত পাপ প্রতীক্ষা করিতেছে, সে সকল মনে করিয়া, কল্পনা করিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্মবল ও সৎসাহস সঞ্চয় করিতে হইবে। এই যে দুই বীর ঈশা ও শাক্য মুনি ইহাঁরা পৃথিবীকে শমন দমন মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ, পাপকে যদি প্রশ্রয় দেও, সাপকে যদি দুগ্ধ দিয়া পোষণ কর, সেই পাপ, সেই সাপ তোমাদিগকে ছাড়িবে না। যখন তোমরা মনে করিতেছ তোমাদের চরিত্রে পাপের লেশমাত্র নাই তখন কল-

নাকে বলিবে "কল্যন, আমার পক্ষে যত পাপ সম্ভব ডাকিয়া আন।" ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় দুর্জ্জয় বলে যদি এই সমুদায় সম্ভব পাপকে বিদায় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের জীবনে প্রবল বেগে ব্রহ্মকৃপাপবন বহিবে, ধর্ম্মের জয় হইবে এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইবে।

কপটতার ঔষধ কপটতা।

রবিবার ২৭এ বৈশাখ, ১৮০৩ শক।

এক প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে যে কারণে রোগ হয় সেই কারণেই রোগের প্রতীকার হয় এইরূপ যুক্তি আছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কথা প্রচলিত আছে, বিষে বিষ ক্ষয় হয়। অতএব পৃথিবীতে যদি পাপমূলক কপটতা রোগ হইয়া থাকে তবে, হে ধর্ম্মচিকিৎসকগণ, তোমরা ধর্ম্মমূলক কপটতা অবলম্বন করিয়া সেই রোগের প্রতীকার কর। পৃথিবীতে কপটতা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এখানে অধার্ম্মিক ধার্ম্মিকের ছদ্মবেশ, ঘোর পাপাসক্ত বৈরাগী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ, এবং নিতান্ত নির্জ্জীব ও অলস পরিশ্রমীর বেশ গ্রহণ করিয়া আত্মগোপন এবং জনসমাজকে প্রবঞ্চনা করিতেছে। মনের ভিতরে যাহাদের অনেক গরল, মুখে তাহারা মধু মাখিয়াছে। যে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে সে তোমার নিকটে সাধুর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে তোমাকে নানা প্রকার বিপদ প্রলোভনে ফেলিবে সে তোমার নিকটে নীতিপ্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছে; যে তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সর্ব্বনাশ করিতে অভিলাষী সে তোমার নিকটে সাধু যোগীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উপাসকগণ, বোধ হয়, তোমরা সকলেই জান অসুরশ্রেষ্ঠ রাবণ ভিখারী যোগীর বেশ ধারণ করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছিল। সেইরূপ অনেক দুরাত্মা অসুর এখনও সাধু মহন্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জনসমাজের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। পৃথিবীতে এত ভয়ানক কপটতা। কপটতাশূন্য লোক প্রায় দেখা যায় না। প্রায় সকলেই কোন না কোন

প্রকার কপটতায় কলঙ্কিত। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস ভক্তি অল্প, আমাদিগের অন্তরে জীবের প্রতি দয়া অল্প, সুশীলতা অল্প; কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করি যেন আমাদিগের কত বিশ্বাস, ভক্তি, কত দয়া সুশীলতা। আমাদিগের ভিতরে সদ্‌গুণ অল্প, কিন্তু দেখাই অনেক। এই মন্দিরে আমরা যতগুলি লোক আছি ঈশ্বরের চক্ষে আমরা প্রত্যেকেই [illegible] তকে [illegible]গুণ প্রকাশ অপেক্ষা অতি অল্প। আশ্চর্য্য এই [illegible] মন নির্গুণ লোক কিরূপে গুণসম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত হয়। [illegible] বাজী কিছুই জান না, জ্ঞান বিজ্ঞানে তুমি কখনও সুনিপুণ হও নাই, অথচ লোকে তোমাকে খুব বিদ্বান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত সুবক্তা বলিয়া সুখ্যাতি করে। কে তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়? কে তোমাদের মধ্যে ক্ষমাশীল? কে তোমাদের মধ্যে বিবেকী বৈরাগী? কে তোমাদের মধ্যে বিনয়ী? কে তোমাদের মধ্যে যথার্থ দয়ালু? তোমাদের মধ্যে কে ষোল আনা কর্ত্তব্য-পরায়ণ? কে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া স্ত্রী সন্তানাদির প্রতি যথাকর্ত্তব্য সাধন করেন? বাস্তবিক আমাদিগের মধ্যে কেহই কোন বিষয়ে সিদ্ধ হন নাই, কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা যে লোকে আমাদিগকে সিদ্ধ বলে। কে ইচ্ছা করে আগে আমরা ভাল হই, তার পর লোকে আমাদিগকে ভাল বলুক। আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী ব্রাহ্ম হই না হই, আমরা ইচ্ছা করি যে লোকে আমাদিগকে ভাল ব্রাহ্ম বলুক। আমরা সকলেই ইচ্ছা করি লোকে আমাদিগকে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বলুক, কিন্তু "সত্যং" বলিবা মাত্র কি বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। বস্তুতঃ আমাদিগের অন্তরে যত টুকু বিশ্বাস, বিবেক বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মজ্ঞান আছে, লোককে তাহা অপেক্ষা কি আমরা অধিক দেখাই না? যদি প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকদিগের মধ্যেও এত কপটতা থাকে তবে কিরূপে পৃথিবীর পরিত্রাণ হইবে? দেবদেব মহাদেবের নিকটে কি এমন কোন অস্ত্র নাই যদ্দ্বারা এই পর্ব্বতসমান কপটতারাশি চূর্ণ হইতে পারে? হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মের নিকটে কি এমন কোন ঔষধ শিক্ষা কর নাই, যাহাতে তোমরা এই ভয়ানক কপটতারোগ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পার? কি অস্ত্রে, কোন্ বাণে তোমরা এই প্রকাণ্ড পাপ কপটতাকে

মারিবে? মহাদেবের নিকটে মহা অস্ত্র আছে। কপটতারূপ পাপাসুর বিনাশ করিবার জন্ম তোমরা সকলে ব্যাকুল হইয়া দেবদেব মহেশ্বরের নিকট গমন কর, তিনি তোমাদিগকে সেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবেন যাহাতে তোমরা নিশ্চয়ই এই অসুর সংহার করিতে পারিবে। বিষ দ্বারা বিষ নষ্ট কর। সেইরূপ কপটতা দ্বারা কপটতা বিনাশ কর, অর্থাৎ যাহারা লোককে দেখাইবার জন্ম নানা প্রকার ধর্ম্মের আড়ম্বর এবং কপটাচরণ করে তাহারা তাহাদিগের বিপরীত আচরণ না দেখিলে কোন মতেই পরাস্ত হইবে না। তাহাদিগের অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য নাই, কিন্তু লোকের নিকটে তাহারা বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে। ইহা অতি নীচ এবং পাপ মূলক কপটতা। ইহার বিপরীত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমূলক কপটতা এই যে—আমার অন্তরে ঈশ্বরের কৃপায় অকৃত্রিম বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু তাহা লোককে দেখাইবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করা দূরে থাকুক বরং তাহা লোকের নিকটে গোপন করিবার জন্ম বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে, এবং এই প্রবলা ইচ্ছা যে সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী ঈশ্বর কেবল তাহার সাক্ষী হইয়া থাকুন। এই সরল পবিত্র কপটতা দ্বারাই কেবল পাপমূলক কপটতা জয় করা যায়। হে পৃথিবীর সাধু সজ্জনগণ, এই কপটতারূপ পাপাসুর সংহার করিবার জন্য আপনারা এই যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হউন, এই অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য আপনারা অব্যর্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করুন, স্বর্গীয় সাহস অবলম্বন করিয়া আপনারা গুপ্ত প্রচ্ছন্ন সদ্‌গুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ঐ অসুরকে বধ করুন। আপনাদিগের অন্তরে যে ঈশ্বরপ্রদত্ত জলন্ত বিশ্বাস, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের অমূল্য রত্ন সকল রহিয়াছে তাহা কপট হইয়া পৃথিবীর চক্ষু হইতে গোপন করিয়া রাখুন। পৃথিবীর প্রশংসারূপ বিষাক্ত বায়ু সাধুদিগের স্বর্গীয় পবিত্রতা দূষিত করে। অতএব আপনারা এই দূষিত বায়ু হইতে দূরে অবস্থিতি করুন। কোন মনুষ্যের মলিন চক্ষু যেন আপনাদিগের সাধুতা দেখিতে না পায়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ব্রহ্মমন্দিরেরবেদী হইতে কপট হইবার জন্য, আত্মগোপন করিবার জন্য কেন উপদেশ হইতেছে? যে বেদী হইতে এত দিন পূর্ণ সরলতা সাধন,

যোগ সাধন ভক্তি সাধন, বিবেক বৈরাগ্য সাধন প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে উচ্চ উচ্চ নীতি শিক্ষা করিলাম, সেই বেদী হইতে আজ কপটতা সাধনের জন্য কেন অনুরুদ্ধ হইতেছি? তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ কর। হে ব্রহ্মসাধকগণ, যখন তোমরা বৈরাগীর বেশে দ্বারে দ্বারে, পথে পথে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে যাও তোমাদিগের হস্তের একতারা এবং গৈরিক বস্ত্র দর্শনে তোমাদিগকে সাধু বৈরাগী বলিয়া জগতের লোক প্রচুর প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু সাবধান তোমরা লোকের প্রশংসায় বিচলিত হইও না। বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া যাহারা প্রশংসা করে তাহাদিগের প্রশংসায় কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ইতিপূর্ব্বে এই বেদী হইতে তোমরা শুনিয়াছ পূর্ব্বকার সাধু বৈরাগিগণ বৈরাগ্যের যে সকল সুলক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছেন, তোমাদিগের পক্ষে সে সমস্ত আদরণীয় ও অবলম্বনীয়। সুতরাং তোমাদিগকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে ঝুলি, একতারা, গৈরিক বস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু এ সকল গ্রহণ করিলেই শত শত লোক তোমাদিগকে হরিভক্ত বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, এবং তোমাদিগকে এমনই বাড়াইবে ও আদর করিবে যে তোমারা লজ্জিত হইবে। বাস্তবিক পৃথিবীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা অতি সহজ। এক ঘণ্টা গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিলে কিংবা একটি উপবাস করিলেই তুমি পৃথিবীর নিকটে যোগী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসিত হইতে পার। অতএব, হে ভক্তগণ, পৃথিবীর নিকটে তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর নিকটে তোমরা প্রচ্ছন্ন থাকিলে তোমাদিগের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদিগের পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে। ঈশ্বর তোমাদিগের হৃদয় দেখিলেই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। বাহ্যিক বৈরাগ্যলক্ষণ সকল দেখাইয়া কদাচ পৃথিবীর নিকটে সুযশঃ ক্রয় করিতে যেন কাহারও ইচ্ছা না হয়, বরং পৃথিবীতে বৈরাগ্য অপ্রকাশিত থাকুক প্রত্যেক সরল বৈরাগীর যেন এইরূপ ইচ্ছা হয়। যে পৃথিবীতে অতিসামান্য কৌশলে যোগী বৈরাগী হওয়া যায় সেই পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিতে কি তোমাদিগের ভয় লজ্জা হয় না? অতএব তোমরা পৃথিবীর নিকটে আত্মগোপন করিয়া সুখ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ

করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও। যাহারা লোকের নিকট প্রশংসা ও সুখ্যাতি অন্বেষণ করে তাহাদিগের মনে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। নববিধানের বৈরাগিদল, তোমরা সরল অন্তরে পৃথিবীকে জানিতে দেও যে যদিও তোমরা সময়ে সময়ে প্রাচীন বৈরাগীদিগের ন্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান কর, তথাপি তোমরা তাঁহাদিগের ন্যায় উচ্চ প্রকৃতির বৈরাগী যোগী নও। অতএব যাহাতে লোকে তোমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসা না করে তজ্জন্য তোমরা গৈরিক বস্ত্রের সঙ্গে এমন কিছু সংযোগ কর যাহা দেখিলে লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস হইবে। পৃথিবীর কপট ধূর্ত্তদিগের অন্তরে কাল, কিন্তু সাধুবেশ পরিয়া বাহিরে দেখায় ভাল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে লোকে দেখুক কাল। তোমরা প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ। তোমরা পৃথিবীকে বল, "হে পৃথিবী, তুমি আর আমাদিগকে ভক্ত যোগী বলিয়া আমাদিগের পায়ে পড়িও না, আর তুমি আমাদিগকে সাধু বিবেকী বৈরাগী বলিয়া বৃথা প্রশংসা করিও না, কেন না আমাদিগের চরিত্রের কত কলঙ্ক এবং অসাধুতা রহিয়াছে।" আত্মসংযম এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য যদি, হে ব্রাহ্মসাধক, তুমি উপবাস করিয়া থাক তবে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া এমনই ভাবে মুখের অবসন্নতা ঢাকিয়া রাখিবে যেন কেহ না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। ঈশ্বরের জন্য অথবা ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি লোকের মনে দয়া উৎপাদন করিবার চেষ্টা কর, তবে তুমি ঈশ্বরবিশ্বাসী নহ। হে ভ্রান্ত মানব, তুমি কি তোমার বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরানুরাগ প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট পুরস্কার প্রত্যাশা কর? মনুষ্য কি তোমার অন্তরের ভাব বিচার করিতে পারে? মানুষের বিচারে কি ভুল নাই, তাহার প্রশংসায় কি গরল নাই? অতএব লোকের নিকটে কদাচ আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও না। একটু সামান্য বাহ্যিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও শাক্যের ন্যায় বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ন্যায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙ্গের ন্যায় ভক্ত মনে করে। যাহার অন্তরে কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই তাহার স্কন্ধে একখণ্ড ক্ষুদ্র গৈরিক বস্ত্র দেখিলে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী সংন্যাসী বলিয়া লোকে তাহার পদধূলি

গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়সা সম্বল নাই লোকে তাহাকে লক্ষপতি বলে, পৃথিবীর এই রীতি। হে ভ্রান্ত মানব, লোকের স্তুতি নিন্দার উপর কিছু মাত্র নির্ভর করিও না। ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তুমি যে সকল কষ্ট বহন কর তাহা জানাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইও না। উপবাস করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া থাক যেন লোকে না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। যাহা ঈশ্বরকে দেখাইবার সামগ্রী তাহা কদাচ লোককে দেখাইবার জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টা করিও না। যদি ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্চন হইয়া থাক লোককে তাহা দেখাইবার প্রয়োজন কি? বাস্তবিক বৈরাগ্য কি বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা দেখান যায়? মুখের উপরে কি বৈরাগ্যের রঙ্গ প্রতিফলিত হয়? যদি তুমি সত্য সত্যই ঈশ্বর-পরায়ণ হও তবে কি তোমার শরীর সম্পূর্ণরূপে তোমার ঈশ্বরভক্তি দেখাইতে পারে? যদি তোমার অন্তরে যথার্থ বৈরাগ্য ও দয়া থাকে, যদি জগতের দুঃখ দেখিয়া তোমার প্রাণ ফাটে তবে তাহা তুমি মানুষকে কিরূপে দেখাইবে? জগতের পাপ দূর করিবার জন্য প্রাণবন্ধু ঈশা কত দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা কি পৃথিবীর কেহ জানে? জরা, রোগ, মৃত্যু, এবং বিষয় বাসনা প্রভৃতি বিবিধ জ্বালা হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য বুদ্ধদেব দয়ালু হইয়া অন্তরে অন্তরে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না। তাঁহাদিগের বৈরাগ্যের সঙ্গে কি আমাদিগের বৈরাগ্যের তুলনা হইতে পারে? আমরা এক দিন নিজ হস্তে রাঁধিয়া খাইলাম, অথবা এক দিন একটি উপাদেয় ফল খাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং চারি দিকে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী সকলে বলিয়া উঠিল, ইহাদের কি বৈরাগ্য। ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের কি প্রগাঢ় ভক্তি। কি গভীর অনুরাগ। হে ব্রহ্মভক্তগণ, সাবধান এ সকল কথায় প্রবঞ্চিত হইও না, যখনই এই প্রকার কথা শুনিবে তৎক্ষণাৎ কাণে হাত দিবে। যদি তোমরা পৃথিবীর সুখ্যাতিতে প্রবঞ্চিত হও, তবে তোমাদের অসদ্দৃষ্টান্তে পৃথিবীর অনেক লোক মরিবে, ভবিষ্যৎ বংশের লোকেরা তোমাদিগের এই সহজ পথ ধরিয়া চারি পয়সার গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করিয়া লোকের নিকট সুখ্যাতি ক্রয় করিবে। তাহারা পৃথিবীর

লোককে বলিবে তোমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে গৈরিক ব্যবহার করিতে দেখিয়া কত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আমরাও সেই গৈরিক ব্যবহার করিতেছি, আমাদিগকেও তোমরা সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি দেও। আমাদিগকেও তোমরা শাক্য, ঈশা, চৈতন্য সদৃশ জ্ঞান করিয়া সমাদার কর। এইরূপে বাহ্যিক লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ভাবী বংশের লোকেরা অতি সহজে পৃথিবীকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিবে, অতএব হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি আত্মসঙ্গোপন কর, তুমি কোন প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংসা কিংবা অনুরাগ পাইতে ইচ্ছা করিও না। তোমার যাহা দেখাইবার তাহা কেবল সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরকে দেখাইবে। যদি তুমি মানুষের নিকট তোমার ধর্ম্মের পরিচয় দিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার নিজের অনিষ্ট এবং জগতের অনিষ্ট হইবে। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য, যোগানন্দরস পান করিবার জন্য তুমি কত কঠোর তপস্যা এবং কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ ও কত প্রকার বৈরাগ্য ব্রত পালন করিয়াছ, তাহা মানুষকে বলিয়া তোমার কি লাভ হইবে? মানুষের নিকট বৈরাগী বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা পোষণ করিও না, বরং তোমার বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের এমন কোন চিহ্ন ধারণ কর, যাহাতে লোকে বলিবে ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় বৈরাগী নহে, ইহাদিগের তেমন আন্তরিক বৈরাগ্য নাই, ইহাদিগের মনে এখনও বিষয়বাসনা বিলাসকামনা রহিয়াছে। যদিও ইহারা গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহারা ভদ্রতা ও সভ্যতাও রক্ষা করিতেছে। ইহারা দীন হীন বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের ন্যায় অপমানিত হইতে চায় না, ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। এইরূপে বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সংসার ধর্ম্মের চিহ্ন রাখিবে। পাত্র অমৃতে পূর্ণ করিবে, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু তিক্ত রাখিবে, তাহা হইলে লোকে তোমাদিগকে প্রাচীন বৈরাগীদিগের ন্যায় উচ্চ মনে করিবে না, বরং বিষয়ী বলিয়া নিন্দা করিবে। লোকে তোমাদিগকে সুখ্যাতি দিবে না, কিন্তু ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার আপনার দরবারের মধ্যে ডাকিয়া দেবতাদিগকে বলিবেন,—"দেখ আমার এই সাধু পুত্রগণ ভিতরে সরলতা পবিত্রতারূপ স্বর্গীয় হীরকখণ্ড গোপন করিয়া

রাখিয়াছে, কিন্তু বাহিরে ইহারা কত নিন্দা ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে।"
হে ভক্তগণ, তোমরা মানুষের সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না
করিয়া কেবল ভগবানের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আপন আপন ধর্ম্ম সাধন
করিয়া যাও, তোমাদিগকে আজ না জানুক হাজার হাজার বৎসর পরে
পৃথিবী তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে। তোমরা প্রাণের ভিতরে ভক্তি
বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের আতর গোলাপ লুকাইয়া রাখ, অন্তরে পুণ্যসূর্য্য
প্রেমচন্দ্র লুকাইয়া রাখ। কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ চমৎকার নিয়ম যে তোমরা
যতই কেন এ সকল স্বর্গীয় সামগ্রী ঢাকিয়া রাখিতে যত্ন কর না, ইহারা
আপনার বলে আপনারা প্রচারিত হইয়া পড়িবে। তোমরা যে পরিমাণে চাপা
দিবে, সেই পরিমাণে বেগের সহিত ইহারা বাহির হইবে। সকল প্রকার
মেঘ ভেদ করিয়া তোমাদিগের অন্তরের বৈরাগ্যসূর্য্য যথাসময় বাহির
হইবে, এবং বাহির হইয়া বলিবে যে আমি ঐ সাধুদিগের অন্তরে গোপনে
ছিলাম, তাঁহারা বলপূর্ব্বক আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেন, হে সূর্য্য তুমি
গোপনে থাক, দেখা দিও না। এখন তাঁহারা পরলোকে গিয়াছেন তাই আমি
প্রকাশিত হইয়াছি। বাস্তবিক, হে ভক্তগণ, তোমরা যতই কেন চাপা দেও
না, তোমাদিগের অন্তরে যদি অকৃত্রিম হরিভক্তি ও বৈরাগ্য থাকে ঈশ্বর তাহা
প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং তখন পৃথিবী তোমাদিগকে মাথায় লইয়া
বলিবে "ইহাঁরাই প্রকৃত সাধু বৈরাগী, কারণ ইহাঁরা এতকাল ইহাঁদিগের
সাধুতা ও বৈরাগ্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।" বন্ধুগণ, তোমা-
দিগের বৈরাগ্য ও হরিভক্তি গোপনে রাখিয়া জনসমাজের মধ্যে থাকিয়া
লোকের মনকে আস্তে আস্তে হরণ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ কর।
তোমাদিগের গুপ্ত ধর্ম্মবল এবং প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্য দ্বারা পৃথিবীর পাপমূলক
কপটতাকে জয় কর।

শব্দব্রহ্ম।

রবিবার ৩জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

শব্দব্রহ্মের তত্ত্ব শ্রবণ কর, এই তত্ত্ব সাধন কর। ব্রহ্মমুখের কথা যত ক্ষণ না বিনির্গত হয় তত ক্ষণ কিছুই সৃষ্ট হয় না, তত ক্ষণ ব্রহ্ম, সৃষ্টিলীলাতে বিহার করেন না, কিন্তু ততক্ষণ তিনি নির্লিপ্ত, স্বতন্ত্র ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করেন। সর্ব্বগুণময় ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আপনার মধ্যে আপনি বাস করিতেন। যত ক্ষণ ব্রহ্মের কথা ব্রহ্মের মধ্যে গোপনে রহিল তত ক্ষণ সৃষ্টি হইল না, ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইল না, চন্দ্র সূর্য্য, সাগর, পর্ব্বত জীব, জন্তু প্রভৃতি কিছুই সৃষ্ট হইল না। অণ্ডের মধ্যে যেমন ভাবী পক্ষী লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মকথাপ্রকাশের পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবক্ষে লুক্কায়িত ছিল যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্ম কথা কহিলেন, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। ব্রহ্ম বলিলেন 'হও ব্রহ্মাণ্ড।" এই ব্রহ্মবাণী গভীর নিনাদে অনন্ত আকাশকে কাঁপাইল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সারি গাঁথা জগতের পর জগৎ, জ্যোতিষ্কের পর জ্যোতিষ্ক, শোভার পর শোভা রচিত হইল এবং উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। সমুদয় সৃষ্টির মূল কারণ ব্রহ্মকথা। ব্রহ্মবাক্য যত ক্ষণ ব্রহ্মমুখে ছিল, তত ক্ষণ সৃষ্টি হয় নাই। তত ক্ষণ সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্মবক্ষে নিদ্রিত ছিল। তখন কোথায় ছিল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি? কোথায় ছিলেন ঈশা মুসা শাক্য গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ? কোথায় ছিল বেদ বেদান্ত? কোথায় ছিল বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ? তখন কিছুই হয় নাই, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারী, ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।' ব্রহ্মকথার অভাবে সমুদয় অপ্রকাশিত ছিল। এই অপ্রকাশের হেতু কি? হেতু এই মাত্র যে তখন ব্রহ্মমুখের শব্দ অথবা সৃজনের ইচ্ছা বাহির হয় নাই। পরে যখনই ব্রহ্মশব্দ বাহির হইল, যখনই ব্রহ্ম বলিলেন 'জগৎ, এস, আলোক, এস' তৎক্ষণাৎ আকাশের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড জগৎ উৎপন্ন হইল, নানা দিকে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল, দিক্ নিরূপিত হইল। সৃষ্টির পূর্ব্বে এত কাল

অসীম আকাশে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ ছিল না। সূর্য্য প্রকাশে দিক্ নিরূপিত হইল। যখনই ব্রহ্মবাণী নিঃসৃত হয় অমনি সমুদয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবাণী নিঃসরণের পূর্ব্বে যেন সমস্ত কাল নিদ্রায় অচেতন ছিল, কোথাও কোন প্রকার চৈতন্য অথবা জীবনের চিহ্ন ছিল না। যখন ব্রহ্ম হুঙ্কার করিয়া বলিলেন 'ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হও,' তখনই দশ দিকে আশ্চর্য্য জীবনের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রহ্মকথা বিনা কিছুই জন্মে না, কোন বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না। ব্রহ্মকথা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু এবং প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের আদি কারণ। এই ব্রহ্মকথা কি? ইহা কোন প্রকার প্রাকৃত শব্দ নহে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁহার এই গূঢ় শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছা প্রভাবে তিনি এই বিচিত্র সৃষ্টি লীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার এ সকল গুণ নিত্য, অনাদি অনন্ত। তাঁহার কোন গুণের আদি কিংবা অন্ত নাই। কেবল দেশ ও কালভেদে নানা প্রকারে এ সকল গুণ প্রকাশিত হয়। এ সকল প্রকাশিত গুণ দেখিয়া কবি, সুলেখক এবং সাধু মহাজনেরা বেদ বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি রচনা করেন। এ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের আদি আছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মবেদের আদি নাই। ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মজ্ঞান অনাদি নিত্য। ব্রহ্ম নিজেই বেদ, তাঁহার মুখ হইতে যে জ্ঞানগর্ভ অশব্দ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে সকল শব্দ শুনিয়া যাঁহারা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন তাঁহারাই বেদলিপিকর। যত দিন ব্রহ্মবাণী ব্রহ্মমুখে থাকে তত দিন বেদ অব্যক্ত অথবা অনিঃসৃত থাকে। ঈশা, মুশা, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন, সুতরাং যদিও তাঁহাদের প্রকাশের আদি আছে, কিন্তু তাঁহারা অনাদি। তাঁহারা এক এক জন ব্রহ্মের যে সকল বিচিত্র স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অবতরণের আগে কি ব্রহ্মেতে সে সকল গুণ ছিল না? ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপ ও গুণ নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। সাধু মহাজনেরা আসিয়া সে সকল বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ করেন। সাধুদিগের অবতরণের এবং ঐ গুণ সমুদায় প্রকাশের আদি আছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা ব্রহ্মের

অন্যান্য গুণের আদি নাই। ব্যক্তব্রহ্ম বেদ, ব্যক্তব্রহ্ম পুরাণ, ব্যক্তব্রহ্ম বাইবেল, ব্যক্তব্রহ্ম শ্রদ্ধেয় মহর্ষি ও যোগী জীবন। কিন্তু সাধুদিগের অবতরণের পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রহ্মের মধ্যে অব্যক্ত ভক্তরূপে এবং অব্যক্ত সাধুগুণরাশিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থাদি লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই গ্রন্থোক্ত সত্য সকল ব্রহ্মের বক্ষে বীজরূপে, অকথিত বাক্যরূপে স্থিতি করিতেছিল। সুতরাং এক দিক সাধু এবং ধর্ম্ম গ্রন্থাদির আদি আছে এবং আর এক ভাবে আদি নাই। যখন অকথিত কথারূপে, অব্যক্ত সত্যরূপে সাধু এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল ব্রহ্মেতে স্থিতি করে তখন তাহাদের আদি নাই। এইজন্য উক্ত হইয়াছে ব্রহ্ম কথা মনুষ্যের আকার ধারণ করিল, কথা ব্রহ্মের সঙ্গে ছিল এবং কথাই ব্রহ্ম। তাঁহার শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার কথা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে এবং যাহা কিছু হইবে সমস্ত ব্যাপারের বীজ দৈব শব্দ। ব্রহ্মের কথা ভিন্ন কিছুই হয় না, কিছুই হইতে পারে না। এই যে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শতাব্দীতে নববিধান প্রকাশিত হইতেছে ইহা তাঁহার কথার ফল। এই নববিধান অব্যক্তরূপে তাঁহার বক্ষে গোপনে ছিল। তাঁহারই কথাতে ইহা জীবোদ্ধারের জন্য যথাসময় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত বক্ষের মধ্যে আরও কত বিধান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কে জানে? গভীর বিরাট পুরুষ ব্রহ্মের ভিতরে বড় বড় হিমালয় সমান প্রকাণ্ড কথা, অকূল অতলস্পর্শ সাগরস্বরূপ কথা সকল রহিয়াছে। অনন্ত কাল আমাদের সম্মুখে প্রসারিত, এখনও তাঁহার মুখ হইতে কত কথা বাহির হইবে কে জানে? শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে আর ব্রহ্মের মুখ হইতে এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নূতন অপূর্ব্ব কথা বাহির হইবে। এক এক যুগ চলিয়া যাইবে, আর ব্রহ্মকথাতে এক এক বিধানপুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে। যুগে যুগে এক এক প্রকাণ্ড বীর পুরুষ ব্রহ্মশব্দ হইতে উৎপন্ন হইবে। অনন্ত গুণশালী বিচিত্র ঈশ্বরের কত শক্তি, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত পুণ্য, কত সুখ শান্তি, তাহা কে ভাবিতে পারে? ভবিষ্যতে তিনি কত নূতন লীলা প্রকাশ করিবেন, কত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন, তাহা কে কল্পনা করিতে পারে? এক এক প্রকাণ্ড ধর্ম্ম বিধান তাঁহার এক এক বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিতেছে। সর্ব্বশক্তি-

মানের শক্তিতে অথবা কথাতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে। তাঁহার কথা, অথবা তাঁহার শক্তি এবং তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। যিনি কথা, তিনিই শক্তি, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ভক্তদিগের আরাধিত হরি, তিনিই নববিধানের জননী। হে ভক্তগণ, তোমরা যাঁহাকে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া কোমল ভাবে জগজ্জননী বলিলে তিনিই অনাদি অনন্ত কথা, তিনিই অশব্দ শব্দ স্বরূপ। ব্রাহ্মসমাজে এত দিন শব্দের মহিমা বিবৃত হয় নাই। এই শব্দ-ব্রহ্মের কাছে আমাদিগকে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মের এক শব্দ এই বাহিরের সুবিশাল বিশ্বমন্দির রচনা করিয়াছে, তাঁহার আর এক শব্দ অধ্যাত্ম-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারই এক এক গম্ভীর নিনাদে জগতের নাস্তিকতা ও পাপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য এক এক ধর্ম্মবিধানরূপ তেজোময় সূর্য্য গঠিত ও প্রকাশিত হইতেছে। যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বে চারিদিকে ঘোরান্ধকার ছিল এবং কোথাও কিছু ছিল না, পরে যখনই ব্রহ্ম হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহতারাপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড, এস," তৎক্ষণাৎ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইল। সেইরূপ বঙ্গ দেশের মানসিক আকাশ ঘোর অবিদ্যা অধর্ম্ম এবং অসত্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্য ব্রহ্ম মুখ হইতে গভীর শব্দ নিনাদিত হইল "নববিধান হউক।" আর সেই শব্দে নববিধানের জন্ম হইল। বঙ্গদেশের পাপ দুঃখ এবং ভ্রম কুসংস্কার দেখিয়া স্বয়ং প্রভু ভগবান্ ব্রহ্ম তাঁহার সমস্ত সাধু সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া নববিধানরূপে প্রকাশিত হইলেন। যেমন প্রবল বায়ু সম্মুখে যাহা কিছু পায় তাহা ভয়ানক রূপে আন্দোলিত করিয়া শোঁ শোঁ করিয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মের বিশেষ কৃপাপবন নববিধানরূপে বঙ্গ দেশের মস্তকের উপর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার বেগে পর্ব্বত সমান বাধা বিঘ্ন সকল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, শত শত বৎসরের সঞ্চিত ভ্রম, কুসংস্কার, কুপ্রথা, অধর্ম্ম, অনাচার, পাপ জঞ্জাল প্রভৃতি একেবারে উড়িয়া যাইতেছে। ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে। নববিধান ব্রহ্মের এক প্রকাণ্ড শব্দ। এই প্রকাণ্ড শব্দের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই প্রকাণ্ড নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মবিধানের

সামঞ্জস্য ও সমষ্টি। ইহাতে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম সমুদয় ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। যেমন মধুর বীণাযন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সংযুক্ত তারের সমষ্টি, সেইরূপ এই নববিধানও নানা প্রকার সুমিষ্ট ব্রহ্মশব্দের লীলা। ইহাতে বিশ্বগুরু ব্রহ্ম তাঁহার শিষ্য সাধকদিগের কর্ণে বিবেক, বৈরাগ্য, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার মন্ত্র দান করিতেছেন। স্বর্গের গুরু কখনও তাঁহার সাধককে বলিতেছেন "বৎস, তুমি ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া তোমার অগ্রজ শাক্য মুনির ন্যায় সকল প্রকার আসক্তি ও বিষয়বাসনা নির্ব্বাণ করিয়া শান্তি ভোগ কর।" সেই সাধককেই আবার অন্য সময় বলিতেছেন "হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি এখন কিছু কাল ভক্তি সাধন কর, যাহাতে তোমার হৃদয় সরস এবং কোমল হয় তজ্জন্য তুমি বিশেষরূপে যত্ন কর, কেবল নির্ব্বাণ ও বৈরাগ্য সাধন করিলে হইবে না, এতদিন আমার গম্ভীর যোগেশ্বর মূর্ত্তি দেখিলে এখন আমার ভক্তবৎসল প্রেমস্বরূপ দর্শন কর, জগতের প্রতি আমার প্রেম দেখিয়া মোহিত হও, কৃতজ্ঞ হও এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হও।" এইরূপে শব্দব্রহ্ম কখনও যোগীকে ভক্ত হইতে বলিতেছেন, কখনও ভক্তকে যোগী হইতে বলিতেছেন, কখনও জ্ঞানীকে কর্ম্মী হইতে বলিতেছেন, কখনও কর্ম্মীকে জ্ঞানী হইতে বলিতেছেন এবং এই নববিধানে তিনি বিশেষরূপে প্রতি জনকে আপনার জীবনে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম এই সমুদায়ের সামঞ্জস্য করিতে বলিতেছেন। যাহাদিগের অন্তর্জ্জগৎ শূন্য ছিল ব্রহ্মের এক এক শব্দে তাহাদিগের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের মধ্যে আশ্চর্য্য সত্যরাজ্য, যোগরাজ্য, প্রেমরাজ্য, পুণ্যরাজ্য এবং শান্তিরাজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মের এক এক হুঙ্কারধ্বনি আসিয়া এক দিকে যেমন জীবের কল্পিত পাপরাজ্য এবং সকল প্রকার আসক্তির বন্ধন খণ্ড খণ্ড করে, অন্যদিকে তাহার পরিবর্ত্তে পুণ্যরাজ্য এবং শান্তিরাজ্য দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করে। ব্রহ্মবাণীর তেজে যখনই সাধকের হৃদয় হইতে ভ্রম ও পাপের অন্ধকার তিরোহিত হইল, তখনই কোটি কোটি স্বর্গের নক্ষত্র তাঁহার পাপপ্রমুক্ত অন্তরে আপনাদিগের দিব্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে লাগিল, এবং তখনই সাধক ঈশ্বরের আলোকে অন্তরে শত শত যোগী

ঋষিদিগের আশ্রম এবং সাধু ভক্তদিগের প্রেম নিকেতন" দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মবাণীতে এইরূপে জীবের পরিত্রাণ হয়। ব্রহ্মবাণী ভিন্ন জীবোদ্ধারের অন্য উপায় নাই। ব্রহ্মবাণীর মৃত সঞ্জীবনী শক্তিতে অচেতন মৃতপ্রায় আত্মা নব জীবন লাভ করে নিতান্ত বিকৃত হৃদয় সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। এই ব্রহ্মবাণী এক এক মহাসাধককে এবং এক এক প্রকাণ্ড জাতিকে অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, এবং মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যায়। ব্রহ্মবাণী ভিন্ন স্বর্গে যাইবার, সত্য লোকে যাইবার অন্য পথ নাই। ব্রহ্মের এক এক প্রকাণ্ড হুঙ্কার ধ্বনি আসিয়া নিদ্রিত পাপীকে জাগ্রৎ করে। সেই যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যোহন দেশে দেশে বলিয়া বেড়াইতেন "অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী" সেই যোহনের কথার মধ্যে ব্রহ্ম শব্দ লুক্কায়িত ছিল। এখনও সেই এক পুরাতন ব্রহ্ম প্রত্যেক পাপীকে বলিতেছেন "অনুতাপ কর।" অনবরত ব্রহ্মের এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, যখনই পাপী নিদ্রায় অচেতন হয় তখনই সেই শব্দ তাহার মাথার কেশ ধরিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে। 'পাপী, অনুতাপ কর," ব্রহ্মের শ্রীমুখাৎ যখনই পাপী এই কথা শুনিল তখনই তাহার শরীর মন জাগিয়া উঠিল; এবং তাহার অন্তরের গূঢ়তম স্থানে পরিবর্তন আরম্ভ হইল, তাহার অন্ধকারময় হৃদয়ের মধ্যে নূতন আলোক, নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই যে বিস্তীর্ণ সৃষ্টির ব্যাপার দেখিতেছি ইহা ব্রহ্মশব্দের কীর্ত্তি। সৃষ্টির আদিতেও এই শব্দ ছিল, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এই শব্দ নানা দেশে নানাবিধ ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। অতএব হে ব্রহ্মভক্ত, তোমাকে বিনীত ভাবে বলিতেছি, তুমি শব্দকে অবহেলা করিও না, শব্দকে ব্রহ্ম মনে করিয়া শব্দের যথোপযুক্ত সমাদর কর। এই শব্দ হইতে জগৎ, জীব, তন্ত্র মন্ত্র, বিধি বিধান, ধন ধান্য, গতি, মুক্তি সমস্ত বাহির হইতেছে। ব্রহ্মমুখ হইতে শব্দ বাহির হইল। সেই শব্দ একটি প্রকাণ্ড তেজরূপে গড়াইতে গড়াইতে অসীম আকাশে বিস্তৃত হইয়া অসংখ্য অগণ্য রাজ্য স্থাপিত করিল, বিচিত্র অদ্ভুত পদার্থ সকল রচনা করিল, নানা প্রকার জীব জন্তু সৃষ্টি করিল, এবং সেই

শব্দ এখনও আপনার কার্য করিতেছে। সেই শব্দের বিশ্রাম নাই। সেই শব্দ যেমন সকলকে সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তাহা সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই শব্দ যেখানে যাহা আবশ্যক সেখানে তাহাই স্থাপন করিয়াছে। এই শব্দই এখানে সূর্য্য, ওখানে চন্দ্র, এখানে পর্ব্বত, ওখানে সমুদ্র, এখানে যোগী, ওখানে ভক্ত, এখানে পুরুষ, ওখানে স্ত্রী, এখানে শাক্য গৌর, ওখানে মুসা ঈশা, এখানে বেদ পুরাণ, ওখানে বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে প্রযোজনীয় বস্তু সকল যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছে। হে ব্রহ্মশব্দ, ধন্য তুমি। কেন না "এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।" একই ব্রহ্মশব্দ অভাব অনুসারে নানা স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই নিঃশব্দ শব্দ তোমার আমার সকলের কাছে আসিতেছে। এই ব্রহ্মশব্দ জীবের অবস্থাভেদে কখনও ঈশ্বরাজের মুখ বিনিঃসৃত গম্ভীর অনুজ্ঞারূপে, কখন স্নেহময়ী জগজ্জননীর মুখবিনিঃসৃত সুমিষ্ট বচনরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই শব্দ কাহাকেও গম্ভীর ধ্বনিতে বলিতেছে, "রে মূঢ় পাপাচারী, পাপাসক্তি ছাড়, অনুতাপ কর, কুসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ কর, সংসারের দাসত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্ম পূজা ব্রহ্ম সেবায় নিযুক্ত হ।" এই শব্দ কাহাকেও বলিতেছে "স্ত্রী পরিবার রাজত্ব ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কিছু কাল গহন কাননে বৃক্ষতলে বসিয়া ঘোর তপস্যা ও ধ্যান সমাধি সাধন কর।" এই জীবন্ত শব্দ আর এক জনকে বলিতেছে হে প্রমত্ত প্রেমিক, গৃহ পরিবার ছাড়িয়া তুমি প্রেমোন্মত্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার কর।" এই তেজোময় শব্দ আর এক জনকে বলিতেছে "বৎস, তুমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলের স্নেহ বন্ধন ছেদন করিয়া নববিধানের শরণাগত হও।" এই জলন্ত অগ্নিময় শব্দ তোমাকে আমাকে বলিতেছে 'ঈশার ন্যায় ব্রহ্মসর্ব্বস্ব হও, শাক্যসিংহের ন্যায় বৈরাগী হও, মহম্মদের ন্যায় দুর্জ্জয় বিশ্বাসী হও, গৌরাঙ্গের ন্যায় প্রমত্ত প্রেমিক হও প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় যোগধ্যানপরায়ণ হও, ও জনকের ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হও।' বাস্তবিক যেমন নামেতে ব্রহ্মেতে অভেদ, তেমনি শব্দেতে এবং তাঁহাতে অভেদ। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শব্দ। তিনি এবং শব্দ এক। ঐ আকাশে যেমন মেঘ

গর্জ্জন করিতেছে, তেমনি চিদাকাশে নিঃশব্দভাবে ব্রহ্ম ডাকিতেছেন। হে নববিধানের সাধকগণ ঐ শুন ঘোর বজ্রধ্বনিতে ব্রহ্মশব্দ আসিতেছে, ঐ শব্দ কখন কাহাকে কি বলিবে কেহ জানে না। ঐ শব্দ শুনিয়া জীবন-পথে চলিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হও। ঐ শব্দ দুস রে না চলিলে কেহই স্বর্গের দিকে, ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ঐ শব্দ আমাদের প্রতিজনের জীবনদাতা এবং ঐ শব্দ আমাদের প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের হেতু। ঐ শব্দ অগ্রাহ্য করিযা কেহই অমরত্বের অধিকারী হইতে পারে না। এস আমরা সকলে নিজের ইচ্ছা অথবা নিজের কথা পরিহার করিযা ঐ ব্রহ্মবাক্যের অনুসরণ করি, নিজের বুদ্ধি ছাড়িয়া ব্রহ্মজ্ঞানালোক দেখিযা চলি। হে শব্দব্রহ্ম, হে বাণীব্রহ্ম, পৃথিবীতে তোমার জয় হউক। চারি দিকে তোমার রাজ্য বিস্তৃত হউক।

মন্ত্র এবং ব্রত।

রবিবার ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

যে রাজ্যে শব্দপূজা হয়, যে রাজ্যে অশব্দ ঈশ্বর শব্দব্রহ্মরূপে অর্চ্চিত হন, সেই রাজ্যে মন্ত্র এবং ব্রতের অত্যন্ত আদর। শব্দকে যাহারা বিদ্রূপ ও পরিহাস করে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইযা আপন ইচ্ছাতে ধর্ম্মসাধন করে। যেখানে শব্দব্রহ্মের আদর, যেখানে ব্রহ্মশব্দ অথবা ব্রহ্মের আদেশের প্রতি অনুরাগ সেখানে নিয়ম, ব্রত, মন্ত্র এবং সাধন প্রণালীর প্রাদুর্ভাব। যেখানে শব্দশ্রবণ নাই যেখানে প্রভুর আদেশের প্রতি নির্ভর নাই, সেখানে লোকেরা আপন ইচ্ছানুসারে, আপন বুদ্ধিমত আপনাদিগের চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন গঠন করে। তাহারা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, ঈশ্বরবাণী শুনিতে পায় না, তাহারা মনে করে তাহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম্মসাধন দ্বারা পবিত্র হইবে ও পরিত্রাণ লাভ করিবে। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে তাহারা আপনাদিগকে আপনাদিগের পরিত্রাতা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা ঈশ্বরবাণীর অপেক্ষা করে না। কিন্তু এই জ্ঞান, এই স্বেচ্ছাচার জীবের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ। তোমরা

ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ ব্রহ্মশব্দ যেমন আমাদিগের স্রষ্টা ও জীবনদাতা তেমনই ইহা আমাদিগের অনন্ত জীবনের হেতু। সুতরাং এই ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ এবং সাধন ভিন্ন কেহই প্রকৃতরূপে অমৃতত্ব আস্বাদন করিতে পারে না। যাহারা এই ব্রহ্মশব্দ না শুনিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মসাধন কিংবা কঠোর তপস্যাও করে তাহারা আত্মার প্রকৃত জীবন ভোগ করিতে পারে না। কেন না ব্রহ্মশব্দই স্বষ্ট আত্মার মধ্যে একমাত্র অমৃত এবং পূর্ণ জীবন। যাহারা সেই অমৃত পান করিল না, তাহারা কিরূপে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে? অতএব, হে মানব, যদি তুমি যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছ বিশ্বাস কর তবে তোমার জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে দেখাও যে ব্রহ্মশব্দ তোমাকে পরিচালিত করিয়াছে। হইলেই বা তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী, কিন্তু তুমি যে ব্রহ্মবাণী দ্বারা পরিচালিত তাহার প্রমাণ কি? তোমার তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ কি? ঈশ্বরমুখের বাণী কি তোমার বেদ? না তুমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া বলিতেছ এই আমার ধর্ম্মশাস্ত্র, এই আমার তন্ত্র মন্ত্র, এই আমার বেদ পুরাণ? তোমার শাস্ত্রের প্রমাণ কি? হে ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী, যদি তোমার শাস্ত্র, ব্রহ্মোপাসনা এবং রীতি নীতি, ও আচার ব্যবহার ব্রহ্মশব্দ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত না হয় তবে তোমার ধর্ম্মকে স্পর্শ করা উচিত নহে। এই নিত্য জীবন্ত ঈশ্বরের নববিধানের সময় তোমার আমার ধর্ম্মকে অথবা মানুষের বুদ্ধিরচিত ধর্ম্মকে আমরা বড় মনে করিতে পারি না। আমরা ব্রহ্মের নিত্য প্রত্যাদেশের পক্ষপাতী, আমরা আদেশবাদী, আমরা ব্রহ্মশব্দবিশ্বাসী। যাহাতে ব্রহ্মবাণীর প্রমাণ নাই তাহাকে আমরা কদাচ সত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যে শব্দ ঘোরান্ধকার মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিল, যে শব্দ ডুবরি হইয়া অকূল অতলস্পর্শ অনন্ত আকাশসমুদ্রের ভিতর হইতে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি মহাবস্তু সকল উদ্ধার করিল, যে শব্দ তোমাকে আমাকে এবং সকলকে জীবন, জ্ঞান, পুণ্য শান্তি দান করিতেছে, দেখাও হে ব্রহ্মভক্ত, যে সেই শব্দ তোমাকে আজ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার সমুদয় কার্য্যে পরিচালিত করিতেছে। দেখাও যে তোমার সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য, সমুদয় কার্য্য সেই ব্রহ্মশব্দের অনুসরণ করিতেছে।

যেখাও যে তোমার উচ্চারিত প্রত্যেক হল্‌বর্ণ ও স্বরবর্ণ ব্রহ্মশব্দ। যেখানে ব্রহ্মশব্দ আসিয়া উপস্থিত সেখানে মানুষ নীরব, সেখানে জীবের মৌনাবলম্বনই ধর্ম্ম। যেখানে ব্রহ্মের ঝড় বহিতেছে সেখানে আর মানুষের বক্তৃতা নাই। স্বয়ং ব্রহ্ম, ভক্তের হৃদয় মধ্যে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, আর সহস্রাধিক শ্রোতা শ্রবণ করিতেছে। প্রণালী কি? ভক্তের রসনা। ভক্ত নিজে চুপ স্থির একেবারে নিঃশব্দ থাকেন। হে ব্রাহ্মসাধক, তুমি নিজে যত নীরব হইবে ততই তোমার হৃদয় ও রসনাকে যন্ত্র করিয়া ব্রহ্ম কথা কহিবেন। হে বক্তা, যখনই তুমি আপনার মত চালাইতে যাইবে তখনই ব্রহ্মবাণী বন্ধ হইবে। যিনি প্রকৃতরূপে ব্রহ্মশব্দকে জানেন, ব্রহ্মশব্দের আদর করেন তিনি নিজে একটি ক্ষুদ্র বর্ণও উচ্চারণ করেন না। ব্রহ্মশব্দ হইতেছে, ব্রহ্মঝড় বহিতেছে তাহার ভিতরে যদি কেহ একটি "ক" উচ্চারণ করে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মশব্দস্রোত অবরুদ্ধ হইবে। হে অনুতপ্ত পাপী, ব্রহ্মশব্দরূপ ঝড় আসিয়া তোমার সমস্ত জীবনের অপবিত্রতা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় তুমি হঠাৎ কেন আপনার কথা বলিয়া ফেলিলে, যদি বাঁচিতে চাও তবে মৌনী হইয়া আবার অনুতাপ কর। যখন ব্রহ্ম কথা কহিতে থাকেন তখন কোন ভক্ত নিজে কথা কহেন না, ভক্ত চুপ করিয়া থাকেন। ভক্তের হৃদয়ে যখনই প্রত্যাদেশ বায়ু বহিতে থাকে, ভক্ত তখনই স্বর্গের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন, ব্রহ্মবাণীর বাতাস উঠিল, বক্তার মুখে আর কথা নাই। যখন ব্রহ্মশব্দরূপ পবন বহিতে লাগিল তখন ভক্ত বলিলেন " হে শব্দ তব পাদপদ্মে আমার এই রসনা উৎসর্গিত হইল। যখনই ভক্ত ঈশ্বরের হস্তে আপনার রসনা উৎসর্গ করিলেন তৎক্ষণাৎ মৃত জড় রসনা ভয়ানক দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় দৌড়িতে লাগিল, এবং নূতন নূতন জীবন্ত সত্য সকল বলিতে লাগিল। শব্দব্রহ্ম, চিন্ময়ী বাগ্‌দেবী সরস্বতী স্বয়ং ভক্তের রসনায় আবির্ভূত। যখন ভক্তের রসনায় ব্রহ্মশব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দের তেজ মৃত ব্যক্তিকে নবজীবন দান করে, অসাধুকে সাধু করে। বিকৃত মানব সমাজকে শাসন ও সংশোধন করিবার জন্য ভক্তের মুখ দিয়া ব্রহ্মশব্দ বিনির্গত হয়। এই শব্দকে অবহেলা করিয়া কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই শব্দ যদি ঘোর দ্বিপ্রহর

রজনীতে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজাকে বলে "হে রাজন্ তুমি, স্ত্রীপুত্র, এবং সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া এক বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হও," সেই রাজাকে তৎক্ষণাৎ ঐ শব্দের অনুগত হইতে হইবে। ব্রহ্মশব্দের বিশ্রাম নাই, নিরন্তর ব্রহ্মমুখ হইতে তাঁহার প্রেমধ্বনি উঠিতেছে, কেবল তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণ সেই ধ্বনি শুনিতে পান। "বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রেমিক যে জন।" প্রেমিকেরা ব্রহ্মের আহ্বান, ব্রহ্মের ডাক অথবা ব্রহ্মবাণী শুনিয়া আপন নির্দ্দিষ্ট জীবন পথে চলিতেছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরাগী না হইলে কেহ এই ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ ও সাধন করিতে পারে না। যেমন আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইয়া শিলাবৃষ্টি অথবা হিমানীখণ্ডের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ব্রহ্মবাণী ভক্তের চিদাকাশে ঘনীভূত হইয়া এক একটি মন্ত্রের আকার ধারণ করে। ব্রহ্ম যে সাধককে তাঁহার সত্তা সাধন ব্রতে ব্রতী করিবেন মনে করেন, তাহার বিশ্বাস কর্ণে তিনি "আমি আছি" এই গম্ভীর মন্ত্র প্রদান করেন। অল্প বিশ্বাসী এবং ক্ষীণবিবেকী ব্রহ্মবাণী শুনিতে পায় না, তাহার নিকটে শব্দের আদর নাই। সে মনে করে শব্দ অথবা মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করা কুসংস্কার। আমরা নববিধানাশ্রিত হইয়া বলিতেছি শব্দই মুক্তির হেতু, "আমি আছি" যিনি বলিতেছেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। "আমি আছি" এই গম্ভীর শব্দ ব্রহ্মমুখ বিনিঃসৃত মন্ত্র। ব্রহ্মমুখের বাণী অথবা ব্রহ্মমুখ-বিনিঃসৃত মন্ত্র নির্জ্জীব দুর্ব্বল মনে জীবন ও বল দান করে, মূঢ় অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনে জ্ঞান চৈতন্য দান করে, অপবিত্র অন্তঃকরণে পবিত্রতা আনিয়া দেয় এবং বিষণ্ন চিত্তকে প্রসন্ন করে। ব্রহ্ম প্রদত্ত মন্ত্র সাধকের বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি, ক্ষমা শান্তি বৃদ্ধি করে, নিত্য নব নব ভাব উদ্দীপন করে। সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োজন। অনুতাপের অবস্থাতে "পতিতপাবন, অধম তারণ, পাপ সন্তাপ হরণ" ব্রহ্মের এ সকল নামমন্ত্র সাধকের পক্ষে বিশেষ কল্যাণদায়ক। উচ্চতর নির্ম্মলতার অবস্থায় "ভক্তচিত্তহারী, ভক্তমনোহরা, সাধু জননী, জগম্মোহিনী, জগজ্জননী" এ সকল মন্ত্র বিশেষ প্রীতিকর ও আনন্দপ্রবর্দ্ধক। এইরূপে সাধকের অবস্থানুসারে ব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপ, শব্দ, নাম অথবা মন্ত্র সাধন আব-

শ্যক। পূর্ণ পরব্রহ্মেতে কোন পরিবর্ত্তন কিংবা অবস্থান্তর নাই; কিন্তু অপূর্ণ উন্নতিশীল জীবাত্মাতে নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। অপূর্ণ জীব একেবারে পূর্ণ ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারে না, এই জন্য তাহার পক্ষে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র সাধন প্রয়োজন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই প্রয়োজন জানিয়াই সাধককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপযুক্ত মন্ত্র সকল দান করেন। হে অল্প বিশ্বাসী, তুমি যদি বল যে তুমি শব্দ মন্ত্র কিছুই মান না, যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মাধীন নহ, তুমি স্বেচ্ছাচারী। যাহারা বলে স্বাধীন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে বদ্ধ হইবে কেন, তাহারা ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব জানে না। যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহারা শব্দব্রহ্মকে মানেন, তাঁহারা ব্রহ্মশব্দের আদর করেন, ব্রহ্মশব্দ সাধন করেন। "আমি আছি" ব্রহ্ম গম্ভীর ধ্বনিতে যে অনন্তকাল নিরন্তর এই নিঃশব্দ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহারা কি দিনে কি নিশীথে এই শব্দ শ্রবণ করেন, এই শব্দ সাধন করেন। "আমি আছি" এই নিত্য গম্ভীর ধ্বনি ঈশ্বরের নাম। সাধক এই নাম ধরিয়া ডাকিলেই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শন লাভ করেন। ঈশ্বরের কোন নাম এবং কোন শব্দ অর্থশূন্য নহে। যাঁহার নাম "আমি আছি" তিনিই নববিধানের দয়াসিন্ধু পতিতপাবন বিধাতা, তাঁহারই অপর নাম ভক্ত হৃদয়বিহারিণী জগজ্জননী। যেমন ঈশ্বরের এক এক নাম বারংবার উচ্চারণ ও সাধন করিতে করিতে সেই নামের অন্তর্গত ভাব সাধকের হৃদয়ে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত ও দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইরূপ, "নববিধান নববিধান" এরূপ বারংবার বলিতে বলিতে আমরা নববিধানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি এবং উহার সুধা পান করিতে পারি। নববিধান শব্দটি পুণ্যপ্রদ। যদিও শব্দ অথবা মন্ত্রের নিজের জীবন নাই; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে মন্ত্র সাধন দ্বারা আমরা পরিত্রাণ এবং দিব্য জীবন লাভ করি। প্রত্যেক ব্রহ্মশব্দ অথবা ব্রহ্মমন্ত্রের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, সুখ শান্তি ঘনীভূত হইয়া স্থিতি করে। কথিত আছে যখন মূসা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিলেন তখন ঘোর ঘটা করিয়া মেঘ সকল আসিয়া চারিদিক ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল, এবং বারংবার বিদ্যুদাগ্নি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেইরূপ যখন সাধকের জীবনে এক এক-

বার ভয়ানক বিপদ্ পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে বিপদভঞ্জন হরি সেই বিপন্ন সাধকের কর্ণে এক এক শব্দ অথবা এক এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সেই মন্ত্রে পাপ যায়, ঘুম ভাঙ্গে। সেই মন্ত্রে সাধকের অশেষ উপকার হয়, সেই মন্ত্রে দুর্ব্বলতার মধ্যে বল, এবং পাপ দুর্গন্ধের মধ্যে পুণ্যের সৌরভ প্রকাশিত হয়। সেই মন্ত্র সাধন করিলে উজ্জ্বলতররূপে ব্রহ্ম দর্শন এবং মুহুর্মুহু ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়। হরিনামের কত গুণ, হরিনাম মন্ত্রের কত মহিমা তোমরা অনেকেই জানিয়াছ। পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, হরি, হরি, শ্রীহরি, মনোহর হরি, সচ্চিদানন্দ হরি বলিলে মন উন্নত হয়, মৃত সঞ্জীবিত হয়, দুর্ব্বল সবল হয় অপবিত্র পবিত্র হয়, দুঃখী সুখী হয়, পাড়া মাতিয়া উঠে, বালক বৃদ্ধ যুবা নরনারী সকলে আনন্দিত হয়। মন্ত্রের এত গুণ, ব্রহ্মশব্দের এত মাহাত্ম্য। দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নির্দ্দিষ্ট কাল ব্রহ্ম আদেশ সাধনই ব্রত। ব্রত বিনা জীবন সুস্থির হইতে পারে না। ব্রত বিনা আজ এই মত ধরিলে, কাল ঐ মত ধরিলে, এবং এই রূপে ক্রমশঃ অস্থিরতার মধ্যে চলিলে। স্বেচ্ছাচারীর দর্পচূর্ণ করিবার জন্য ব্রত একান্ত আবশ্যক। সত্যকথনব্রত বিদ্যাদান ব্রত, দয়াব্রত, পশুসেবা ব্রত, ক্ষমা ব্রত, রিপুসংহার ব্রত, বৈরাগ্য ব্রত, যোগ ব্রত, ভক্তি ব্রত, সেবা-ব্রত, এ সমস্ত ব্রতই ব্রহ্মবাণী অথবা ব্রহ্ম আদেশ। যেমন ব্রহ্মেতে এবং মন্ত্রেতে কোন প্রভেদ নাই, তেমনি ব্রহ্মেতে ও ব্রতেতে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মই ব্রত। যিনি আদেশ করেন সেই প্রভু কিংবা কর্ত্তার সঙ্গে তাঁহার আদেশের কোন প্রভেদ নাই। সেইরূপ ব্রত ও মন্ত্র দাতা গুরু ব্রহ্মের সঙ্গে মন্ত্র ও ব্রতের প্রভেদ নাই। অতএব হে স্বেচ্ছাচারী মানব, তুমি আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র ও ব্রতের পথ গ্রহণ কর। এই পথ গ্রহণ না করিলে কখন জীবন পবিত্র হইবে না। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও শাসন ব্রতের আকারে উপস্থিত হয়, ব্রতের সমস্ত নিয়ম ব্রহ্মমুখবিনিঃসৃত। হে সাধক, এক সপ্তাহ তুমি এই ব্রত নিয়ম পালন করিবে, ইহার অর্থ এই যে এক সপ্তাহ ব্রহ্মের কৃপাপবন বিশেষরূপে তোমার মস্তকের উপর দিয়া বহিবে। সত্য পালন করিবে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে বিনয়ী ও দয়ার্দ্র হইবে, ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ করিবে, রিপু সংহার এবং ইন্দ্রিয় জয়

করিবে বৃহৎ ব্রতধারী হইয়া সংসার জয় করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবে, এ সকল আদেশপূর্ণ প্রত্যেক ব্রত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জড়তা আলস্য দূর করে এবং বিকৃত আত্মাকেও সংশোধিত প্রকৃতিস্থ করিয়া ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করে। ব্রহ্মপ্রদত্ত প্রত্যেক ব্রত জীবের কল্যাণপ্রদ। অতএব ব্রহ্ম যে শাসনে আমাকে রাখিতে চাহেন আমি সেই শাসনে শাসিত হইব। তিনি আমাকে যে মন্ত্র, যে ব্রত দেন তাহাই আমি সাধন করিব। স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বোধ মনুষ্য জানে না ব্রত মন্ত্রের কত গুণ। ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মানুগত ব্যক্তি বুঝিতে পারেন কোন্ মন্ত্র তাঁহার পক্ষে কখন আবশ্যক, তিনি বুঝিতে পারেন এই মন্ত্র এই শাসন আমার জন্য, এই ব্রতের আকারে আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ আসিয়াছে। যাঁহারা এইরূপ ব্রত পালন করেন, তাঁহারা নানা প্রকার প্রলোভন, ও পাপের ব্যভিচার হইতে মুক্ত থাকিয়া অনায়াসে ভবসাগর পার হইয়া ঈশ্বরের শান্তিনিকেতনে চলিয়া যান। যাহারা মন্ত্র ব্রত মানে না তাহাদের দেবতা মৃত। কেন না যে ঠাকুর কথা কহে না যে মা কোলে এস বলে না, সে ঠাকুর কি জীবন্ত ঈশ্বর, সে মা কি দয়াময়ী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী? যে দেবতা সহস্র প্রার্থনারও একটি উত্তর দিতে পারে না, যাহার একটি মন্ত্র দিবারও ক্ষমতা নাই সেটা মৃত নিদ্রিত অপদার্থ। যদি ব্রহ্ম কথা না কহেন, যদি অবস্থানুসারে ব্রহ্ম উপযুক্ত মন্ত্রণা না দেন তবে, হে সাধক, তুমি কি রূপে বাঁচিবে? আমার সঙ্গে যিনি কথা কহেন, যিনি আমার কথার উত্তর দেন, যিনি দুর্ব্বলতার সময় বল দেন, পাপবিকারের ঔষধ দেন, দুঃখের সময় সান্ত্বনা এবং প্রাণ ভরিয়া সুখ শান্তি দেন, তিনিই আমার বন্ধু, তিনিই আমার জীবনদায়িনী মাতা।

দুই পক্ষী।

রবিবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

বেদান্ত মধ্যে দুই সুন্দর পক্ষীর কথা বোধ হয় অনেকে শুনিয়াছেন। একটি নয়, দুইটি পক্ষী। "দ্বা সুপর্ণা।" অদ্বৈত নয়, দ্বৈত। দুই পক্ষী একত্র হইয়া এক বৃক্ষে স্থিতি করে। দুই পক্ষী পরস্পরের সখা, কিন্তু তাহাদের অবস্থা ভিন্ন। এক পক্ষী সৃষ্ট, আর এক পক্ষী স্রষ্টা, এক পক্ষী ক্ষুদ্র, অপর পক্ষী বৃহৎ ও অনন্ত, এক পক্ষী দয়ার পাত্র, অপর পক্ষী অনন্ত দয়ার সাগর, এক পক্ষী ফল ভোগ করে, অপর পক্ষী ফল-প্রদাতা। এই দুই সুন্দর পক্ষীর কথা অতি সুন্দর, বিজ্ঞান অতি মনোহর। অতএব হে ব্রহ্মভক্তগণ, স্থির হইয়া তোমরা এই দুই সুন্দর পক্ষীর তত্ত্ব শ্রবণ কর। প্রথমে মত শ্রবণ কর, পরে সাধন প্রণালী শুনিবে। হে বিশ্বাসী, তোমার এই দেহ মধ্যে দুইটি পাখী একত্র সুখে বাস করে। তুমি জ্ঞান দ্বারা এই তত্ত্ব স্বীকার কর। তোমার এই দেহ একটি বৃক্ষ, এই বৃক্ষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়েছে। এই দেহবৃক্ষ সাকার, কিন্তু ইহার ডালে দুটি নিরাকার পক্ষী বসিয়া আছে। বাসগৃহ সাকার, কিন্তু অধিবাসী দ্বয় নিরাকার। হে ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি মনে কর তোমার দেহবৃক্ষে কেবল একাকী তুমি বাস কর, কিন্তু তোমার পার্শ্বে যে অপর একটি বৃহৎ পক্ষী বসিয়া আছে তুমি তাহাকে দেখ না। হে আত্মান্, সর্ব্বদা তুমি আমি আমি বল কেন? তুমি কি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছ না আপনাকে আপনি জীবিত রাখিতে পার? তোমার স্রষ্টা এবং তোমার প্রতিপালক যে তোমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহার শক্তি ভিন্ন যে তুমি কিছুই করিতে পার না। তবে কেন 'আমি আহার করি, আমি চিন্তা করি, আমি দয়া করি, আমি ধর্ম্মসাধন করি,' এ সকল কথা বলিয়া বৃথা অভিমান কর? যখন ঈশ্বর ভিন্ন তুমি নিমেষের জন্যও বাঁচিতে পার না তখন আমির পরিবর্ত্তে আমরা বল না কেন? প্রাচীন যোগী ঋষি এবং

শাস্ত্রকারেরা দুই পক্ষীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব, হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা সকলেই আমির পরিবর্ত্তে আমরা তুমির পরিবর্ত্তে তোমরা তিনির পরিবর্ত্তে তাঁহারা এই ভাষা ব্যবহার কর। এক দেহবৃক্ষ দুটি পাখীর বাসস্থান। প্রত্যেক দেহপিঞ্জরে যুগল পক্ষী বিহার করিতেছে। আমরা দুটি পাখী, তোমরা দুটি পাখী, তাঁহারা দুটি পাখী। প্রত্যেক নরদেহে প্রত্যেক নারীদেহে দুই আত্মা বাস করিতেছে। একটির আগে 'জীব' শব্দ অর্থাৎ একটী জীবাত্মা, অপরটির আগে 'পরম' বিশেষণ অর্থাৎ অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মার কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা পরমাত্মাতে নাই এবং পরমাত্মার অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা জীবাত্মাতে নাই। এই জন্য উভয়ের স্বতন্ত্র বিশেষণ হইয়াছে। কিন্তু দুটিই অতি সুন্দর, লাবণ্যযুক্ত, মনোহর। যদিও দুটির মধ্যে কোনটিরই আকার নাই, কিন্তু নিরাকার হইয়াও উভয়েই অশেষ সৌন্দর্য্য ও গুণশালী। হে মানব, তুমি যাহাকে আমি বলিতেছ এই আমিকে কাটিলে দুটি সুন্দর পাখী বাহির হইবে, একটি তুমি, অপরটি তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার এই দেহের অধিকারী স্বামী কেবল তুমি নহ। তুমি যাহাকে তোমার দেহ, মন, হৃদয় আত্মা বলিতেছ, সেই দেহ, মন, হৃদয় আত্মার অধিকারী তুমি এবং তোমার ঈশ্বর। প্রত্যেক আমিকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার ভিতর হইতে এইরূপে দুই আমি বাহির হইবে, এক জীব আমি, আর এক পরম আমি, এক সৃষ্ট আত্মা আর এক স্রষ্টা অথবা পরমাত্মা। এক আমির ভিতরে দুই অতীন্দ্রিয় আত্মা। এক আধারে দুই অদৃশ্য আধেয়। একাধারে, এক গাছে, এক শরীরে এই দুই নিরাকার পক্ষী, দুই সুন্দর আত্মা নিয়ত বাস করিতেছে। হে মনুষ্য, তোমার দেহবৃক্ষে নিত্য দুই পাখী স্থিতি করিতেছে, এক পাখী তুমি, আর এক আকাশরূপ বৃহৎপক্ষী অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষী। এই দুই সুন্দর পক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, এই দুই সুন্দর পক্ষীকে যত দেখিবে, ততই তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে, ততই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান পরিষ্কার হইবে। হে জীব, হে সাধক, যতই তুমি এই কথা ভাবিবে, যতই তুমি এই গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করিবে, যে তুমি এবং ব্রহ্মপক্ষী এক দেহবৃক্ষে বাস করিতেছ, একত্র কার্য্য করিতেছ, একত্র কথা বলি-

তেছ, একত্র ভাবিতেছ, একত্র হইয়া জগতে দয়া বিস্তার, এবং ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ ততই তুমি উন্নত, শুদ্ধ এবং সুখী হইবে। ব্রহ্মপক্ষী এবং আমি, এই আমরা দুই জন একত্র থাকি, একত্র কার্য্য করি, এ চিন্তা স্বর্গীয় চিন্তা, এ চিন্তা নবজীবনের হেতু এবং পরিত্রাণপ্রদ। ব্রহ্মবিশ্বাসী এবং ব্রহ্মভক্ত বলেন, যখনই আমি আমার দেহবৃক্ষের দিকে তাকাই, তখনই দেখি দুটি স্বর্গের পাখী একত্র বসিয়া আছে, একটি ছোট, একটি বড়। এই দুই স্বর্গের পক্ষীকে একত্র দেখিলে যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হয় এবং ব্রহ্মানন্দ লাভও হয়। হে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, যখনই তুমি তোমার দেহবৃক্ষে জীবাত্মাকে দেখিবে, তখনই তুমি তাহার অব্যবহিত পার্শ্বে পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। পরমাত্মা চিরকাল অনশন ব্রতধারী, তিনি আহার করেন না, তিনি মহাযোগী, চিরনিস্তব্ধ, নিত্য ধ্যানশীল, তাঁহার আলস্য নাই, তিনি নিদ্রা যান না, অনন্তকালের পক্ষী, স্রষ্টা পক্ষীর কোন প্রকার ভোগবাসনা নাই, তিনি চির বৈরাগী, তিনি পরম বৈরাগী; কিন্তু সৃষ্ট পক্ষী, স্রষ্টা পক্ষী হইতে নানা প্রকার ফল এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল লাভ করিতেছে, সে সকল ভোগ করিতেছে, ক্ষুদ্র সৃষ্ট পক্ষী কখনও মনের আনন্দে স্রষ্টাপক্ষীর গুণকীর্ত্তন করিতেছে, কখনও অলস হইতেছে, কখনও জাগ্রৎ ভাবে ব্রহ্মধ্যান করিতেছে, কখনও নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িতেছে। হে ব্রহ্মজ্ঞ, তুমি এই যুগলপক্ষিতত্ত্ব স্মরণ করিয়া রাখ। যাহাকে তুমি আমি বলিতেছ, এই আমির মধ্যে দুই আমি স্থিতি করিতেছে। এক ছোট আমি, আর এক বড় আমি; এক 'জীব' আমি আর এক পরম' আমি। শাস্ত্রেতে এই যুগল পক্ষীর প্রমাণ পাইলে এবং দিব্য জ্ঞানে ইহা বুঝিলে। এই নিগূঢ় দ্বৈততত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিলে এখন ইহার সাধন প্রণালী অবধারণ কর।

আমি দুই, আমার এই দেহবৃক্ষে আমি একাকী বাস করিতেছি না; কিন্তু আমি এবং আমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক একত্র বাস করিতেছি,— বারংবার স্মৃতি ও চিন্তা দ্বারা এই নবজীবনপ্রদ সত্য অন্তরে আয়ত্ত কর এবং বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ইহা জীবনে পরিণত কর। কখন আপনাকে ঈশ্বর-বিহীন মনে করিবে না। আমি কর্ত্তা, আমি প্রভু, আমি স্বামী কদাপি

মনের মধ্যে এই বিষাক্ত অহঙ্কার পোষণ করিবে না, কিন্তু নিয়মিত সাধন দ্বারা সর্ব্বদা সমুর্ব্বশাধার, সকলের কর্ত্তা ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবে। কি শারীরিক কি মানসিক প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিবে। যখন তুমি চক্ষু কর্ণ, নাসিকা এবং রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং অস্বাদন কর, তখন তুমি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়শক্তির মূলে ঈশ্বরের শক্তি উপলব্ধি করিবে, এবং যখন তুমি তোমার মনের শক্তি সকল পরিচালন কর, তন্মধ্যেও তুমি ঈশ্বরের শক্তি দেখিবে। কেন না তাঁহার শক্তি ভিন্ন তুমি একটী সচ্চিন্তা করিতে পার না, একবিন্দু প্রেম অথবা পুণ্যও উপার্জ্জন করিতে পার না। তিনি সকল শক্তির মূলশক্তি। যেমন তিনি ভিন্ন তুমি তোমার হস্তপদ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ পরিচালন করিতে পার না, তেমনি তাঁহার শক্তি ভিন্ন তোমার মন চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপে দেখিবে, তুমি এবং তোমার স্রষ্টা দেহবৃক্ষ মধ্যে দুচ্ছেদ্য যোগশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছ। স্রষ্টাকে অতিক্রম করিয়া সৃষ্ট আত্মা কিছুই করিতে পারে না। স্রষ্টাপক্ষী এবং সৃষ্ট পক্ষী দুটি বন্ধু পার্শ্বে পার্শ্বে বসিয়া সর্ব্বদা আমোদ করিতেছে। যখনই ভাবিবে তখনই দেখিবে, দুই পাখী দৃঢযোগে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি করিতেছে। হে বিশ্বাসি, তুমি কখনও আপনাকে ঈশ্বর ছাড়া ভাবিতে পার না। ক্রমাগত বিশ্বাসভক্তিনয়নে দেখ তোমার সর্ব্বাঙ্গে দুই পক্ষী বেড়াইতেছে। একটি ফল দিতেছেন, অপরটি ফল ভোগ করিতেছে, ছোট ছানা পক্ষী বড় স্রষ্টা পক্ষীর পক্ষপুটে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে নিজ দেহবৃক্ষের মধ্যে নিয়ত এই দুই সুন্দর পক্ষীর খেলা না দেখিলে তুমি প্রকৃতরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ব্রহ্মভক্ত হইতে পার না। এই দুটি পাখী সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। যখন তুমি একটি সুন্দর গোলাপফুল দর্শন কর, তখন স্রষ্টা পাখী তোমাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা দেন এবং তুমি সৃষ্ট পক্ষী তাহা দর্শন কর। আবার যখন তুমি মধুর ব্রহ্ম সঙ্গীত শ্রবণ কর, স্রষ্টা পক্ষী তোমাকে শ্রবণ করিবার শক্তি দেন, তুমি শ্রবণ কর। অথবা যখন তুমি নিজে বিভুগুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর, তখন স্রষ্টা পক্ষী তোমার রসনাতে বসিয়া তোমাকে

বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তি দেন। আবার যখন তুমি বাহ্যিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া মনের মধ্যে ধ্যান চিন্তা করিতে লাগিলে, তখন তোমার রসনা হইতে দুটি পাখী ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া মনের মধ্যে গেল। স্রষ্টা পক্ষী মনের মধ্যে বসিয়া তোমাকে চিন্তা করিবার শক্তি, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবার শক্তি দিতে লাগিল। এই-রূপে মনের প্রত্যেক কার্য্য এবং শরীরের প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বরের শক্তিতে নির্ব্বাহ হয়। ঈশ্বর শক্তিদাতা, জীবাত্মা শক্তি গ্রহীতা। হে হৃষ্ট আত্মন্, তোমার অব্যবহিত সন্নিধানে স্রষ্টা পাখী নিত্য বসিয়া আছেন, তিনি তোমার সমস্ত অভাব মোচনের আয়োজন করিয়া দিতেছেন। তোমার চাহিতেও হয় না, তোমার চাহিবার পূর্ব্বে তিনি জানিয়া তোমাকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করিতেছেন। তোমার শরীরে অন্ন, জল ও বল স্বাস্থ্য দিতেছেন এবং তোমার আত্মাতে ধর্ম্ম পুণ্য শান্তি বিধান করিতেছেন। তিনি তোমাকে তাঁহার অজস্র দয়াগুণে বদ্ধ করিতেছেন। এইরূপে দুটি পক্ষীর পরস্পরের সখ্যভাব বৃদ্ধি হইতেছে। যখন দুই জনের সৌহার্দ্দ ঘনীভূত হয় তখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে বলেন,— "পরমাত্মন্, আর যে তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না।" পরমাত্মা জীবাত্মাকে বলিলেন "হে ক্ষুদ্র জীবাত্মা, তুমি আমাকে এত ভাল বাস যে তুমি আমা ছাড়া আর কাহাকেও জান না, অতএব আমিও তোমাকে নিত্য আমার চক্ষের ভিতরে রাখিব।" এই রূপে দিন দিন বৎসরে বৎসরে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ বাড়িতে থাকে। অনন্ত প্রেমের আধার পরমাত্মা কদাচ জীবাত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আবার যখন উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় তখন জীবাত্মাও পরমাত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, তুমিও সাধন দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার সখ্যভাব এত দূর প্রগাঢ় কর যে তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে সেই উচ্চতম অবস্থায় উপস্থিত হও, যেখানে ছোট পাখীটি অনুগত ভৃত্য হইয়া বড় পাখীর ভিতরে চিরাশ্রিত হইয়া থাকিবে এবং বড় পাখী ছোটটিকে আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া লইবে। এই

পাখীর গল্প মজার গল্প, দুই সুন্দর পাখীর কথা মনোহর ভাগবত কথা। পরমাত্মা পক্ষী এবং জীবাত্মা পক্ষী উভয়ই অত্যন্ত সুন্দর এবং লাবণ্যযুক্ত, উভয়ে পরস্পরের লাবণ্যে আসক্ত। আবার ছোট পাখীটি যতই বড় পাখীর সৌন্দর্য্যে অনুরক্ত হয়, ততই সে নিজে আরও উজ্জ্বলতর ও প্রিয়দর্শন হয়। ছোট পাখীটি যতই বড় পাখীর সৌন্দর্য্যরস পান করে, বড় পাখীর সুস্বর শ্রবণ করে এবং বড় পাখীর সহবাসে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। অতএব হে ভক্তপক্ষি, তুমি অনলস হইয়া পরমাত্মা পক্ষীর শক্তিতে শক্তিমান্ হও, তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী হও, তাঁহার প্রেমে প্রেমিক হও, তাঁহার পুণ্যে পুণ্যবান্ হও এবং তাঁহার সুখে সুখী হও। এই মন্দিরে যত নর নারী আছেন, প্রত্যেকের দেহবৃক্ষে দুটি পাখী খেলা করিতেছে। আমি পরমার্থতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব বলিতেছি, তোমরা শুনিতেছ। আমার মধ্যেও দুই পাখী, তোমাদের মধ্যেও দুই পাখী। তোমাদের প্রত্যেকের দেহবৃক্ষের ডালে দুটি পাখী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে; এক পাখী শুনিতেছে, অপর পাখী শুনিবার শক্তি দিতেছেন। আমি যে বলিতেছি, আমার মধ্যেও দুই পাখী খেলা করিতেছে, কার্য্য করিতেছে, এক পাখী বলিবার শক্তি দিতেছেন, অপর পক্ষী বলিতেছে। এই দুই সুন্দর পক্ষীর মিত্রতা ও যোগতত্ত্ব জানিয়া বড় সুখী হইলাম। আহা! কি সুখের কথা, আমি কখনও একাকী নহি, আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী নিত্য আমার কাছে কাছে রহিয়াছেন। আমি দিবা নিশি অবিশ্রান্ত সেই পূর্ণ প্রেমপক্ষীর পক্ষপুটে প্রতিপালিত, আচ্ছাদিত ও আশ্রিত হইয়া রহিয়াছি। আমি প্রতিদিন প্রেম ভক্তি ফুলে এই প্রেমপক্ষীর পূজা করিব, এই সুন্দর পরম পক্ষীকে আমার বক্ষে বসাইব, এই পাখীর সুস্বরযুক্ত বাক্য এবং সুমধুর সঙ্গীত শুনিব, এই পাখীর সঙ্গে নিগূঢ় সৌহার্দ্দে সংযুক্ত হইয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। কি গৃহে কি কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা আমি এই পক্ষীর সঙ্গে থাকিব, ইহাঁর সঙ্গে থাকিলে পাপ প্রলোভন অসম্ভব হইবে। মার পক্ষপুটের শোভা দেখিয়া এবং তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া শান্তি সুখ সম্ভোগ করিব। দুই জনে মনের আনন্দে একত্র গান করিব, পরস্পরের সুস্বর ও সঙ্গীতের বিনিময় হইবে, আমার আর সুখের

সীমা থাকিবে না। আমি আমার এই পার্শ্বস্থ, এই অন্তরতম, নিকটতম পরমাত্মা পক্ষীর পূজা ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। এই প্রেমপক্ষীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইব, অন্য সৌন্দর্য্য আর আমার ভাল লাগিবে না, এই পক্ষীর সুস্বর ছাড়িয়া আর পৃথিবীর লোকের কর্কশ স্বর শুনিতে যাইব না। ইহাঁর সহবাস ছাড়িয়া আর পাপভয়পূর্ণ লোকের সহবাস অন্বেষণ করিব না। পুত্র যেমন পিতা মাতার উপরে নির্ভর করে এবং তাঁহাদিগকে ভালবাসে, সুহৃদ বন্ধু যেমন সুহৃদ বন্ধুকে হৃদয়ের প্রেম দেয়, তেমনি আমরা এই পক্ষ কে পিতামাতা ও পরম সুহৃদ জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইব।

তিন যুদ্ধ।

রবিবার ২৪ জৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আচার্য্য, নববিধান প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে যে তিন মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ বলুন এবং তাহা হইতে জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ কি কি মহাসত্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলুন।" আচার্য্য বলিলেন, অতি সুন্দর প্রশ্ন হইয়াছে। তবে সেই তিন মহাযুদ্ধের কথা শ্রবণ কর এবং বিধাতার প্রেমলীলা-রস পান কর। যখন এই দেশে মূর্ত্তিপূজার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল এবং পৌত্তলিকতার অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই সময়ে বিধাতা পুরুষ, ভারতবর্ষেয় ঈশ্বর বিশেষরূপে তাঁহার অতুল মহিমা এবং অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি কএক জন মহানুভব ব্যক্তির মনোমধ্যে জ্ঞানের আসনে বসিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন ভারতবর্ষের চারিদিকে নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজা হইতেছিল, সেই সময়ে সনাতন ব্রহ্ম ভারবর্ষ এবং সমস্ত জগৎ হইতে সকল প্রকার অসত্য এবং পৌত্তলিকতা দূর করিবার জন, কএক-জন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মনে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ করিলেন। সেই কএকজন ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী সাহসপূর্ব্বক তুরীভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য বাজাইয়া ভারতের আকাশে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই নিশান উড়াই-

লেন। তাঁহাদিগের নিকটে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া বঙ্গদেশের এবং ভারতবর্ষের অনেকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিশান উড়িল, অপর দিকে তেমনি পৌত্তলিকেরা একেশ্বরবাদীদিগকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কে জানিত,কোন্ পক্ষের জয় লাভ হইবে। অল্পবিশ্বাসী সাধারণ লোকেরা মনে করিল, যে দিকে লোকসংখ্যা অধিক সেই দিকেরই জয় হইবে; কিন্তু সত্যেরই জয় হইল। সত্যসূর্য্যের উদয়ে অসত্য পৌত্তলিকতার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। যে দেশ সেই এক পুরাতন সনাতন পরব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই অতীন্দ্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঘোরতর পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই দেশ আবার অদ্বিতীয় প্রাচীন পরব্রহ্মকে মাথায় করিয়া লইল। দেশ দেশান্তরে একমেবাদ্বিতীয়মের নিশান উড়িতে লাগিল। এক ঈশ্বর আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার মূর্ত্তিপূজাকারীদিগের সঙ্গে একশ্বর বাদীদিগের মধ্যে এই যে মহাযুদ্ধ উহা দেশ উদ্ধারের জন্য, দুঃখী দুঃখিনীদিগের পরিত্রাণ জন্য, অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বয়ং ঘটাইলেন। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া সত্যের বলে বলবান্ হইয়া একেশ্বরবাদিগণ অসত্য পৌত্তলিকতার দুর্গ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈরের সাহায্যে তাঁহারা বিঘ্ন বিপত্তির সাগর অতিক্রম করিয়া পরিণামে জয় লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও যত্নে চারিদিকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বর এক, ঈশ্বর দুই নহেন, ঈশ্বর তিন নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর হইতে পারে না। যিনি অসংখ্যগুণধারী পরব্রহ্ম, যিনি কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন তিনি এক।" প্রথম মহাযুদ্ধে এই আদি সত্য জয় লাভ করিল এবং ভারত ভূমিতে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম যুদ্ধে ঈশ্বর জয়ী হইলেন এবং তাঁহার অনুগত একেশ্বরবাদিগণ পৌত্তলিক হিন্দু সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত

হইল। এইরূপে প্রথম যুদ্ধে বিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের বলে সত্যের অনুরোধে, মূর্ত্তি উপাসকদিগের দল পরিত্যাগ করিয়া আমরা একটি ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দল সত্যধামের দিকে চলিলাম। ইহার পর কিছুদিন আমরা কুশলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সমাজ অথবা ব্রহ্মোপাসকদিগের সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয়বার এ দেশে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র একেশ্বরবাদী দলের ভিতরে আবার বিভাগ হইল। প্রথম যুদ্ধে প্রকাণ্ড পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ হইতে একেশ্বরবাদিগণ বিচ্ছিন্ন হইলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেকপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে নির্ব্বাসিত ও বিচ্ছিন্ন হইলেন। প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সনীর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন; কিন্তু কএক জন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন; "কেবল সপ্তাহান্তে এক বার সাময়িক ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিলে হইবে না, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসানুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। দৈনিক জীবন ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে এবং সমস্ত জীবন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করা উচিত নহে, অতি সামান্য বিষয়েও মনুষ্যের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্য সকলই বিবেকের অনুমোদিত হওয়া উচিত।" প্রথমোক্ত ব্রহ্মবাদিগণ জীবনপথে এত দূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতাপুরুষ তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নব্য যুবা-

দলের মনে স্বর্গীয় সৎসাহস এবং দুর্নিবার উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয়লাভ করিল। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগী দল জীবন্ত ভাবে বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ ক্রমশঃ শুষ্ক, নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতন্ত্র হইয়া জীবনশূন্য ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। প্রথম যুদ্ধে একেশ্বরবাদিগণ প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেকী ব্রহ্মভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। উভয় যুদ্ধেই বিচ্ছেদ হইল, কিন্তু এই বিচ্ছেদ মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায়সম্ভূত। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগী নব্যদল প্রাচীন দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—' হে ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাদের ইচ্ছা হউক। কি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, কি গৃহ ধর্ম্মানুষ্ঠান, কি দৈনিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, সমুদায় বিষয়ে, হে অদ্বিতীয় সর্ব্বাধিকারী মহাপ্রভু পরমেশ্বর, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শক্তি দাও।" এই রূপে দ্বিতীয় যুদ্ধে ভারতের আকাশে ব্রহ্মের ইচ্ছার নিশান উড়িল এবং ব্রাহ্মসমাজে বিবেকের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। নিজের ইচ্ছা অথবা স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া বিবেকের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, বিষয়সুখভোগলালসা নির্ব্বাণ করিয়া বৈরাগ্যব্রত পালন করিতে হইবে, এই স্বর্গীয় সুন্দর ছবি দেখাইবার জন্য, এই মত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সংগ্রামে ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার অনুগত বিবেকী সন্তানগণ জয়ী হইলেন। প্রাচীন সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া নূতন দল ঈশ্বরাজ্ঞায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন এবং কিছু কালের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিয়মিতরূপে সবান্ধবে ব্রহ্মপূজা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা ইহাঁদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিতে লাগিল; এবং ইহাঁদিগের চরিত্র শাসন করিতে লাগিল। প্রথম যুদ্ধে সত্যের জয় হইল, দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক অথবা ব্রহ্মের ইচ্ছার জয় হইল।

কিছুকাল পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার স্বর্গলোকে নানা প্রকার যুদ্ধের অস্ত্র সকল চক্ মক্ করিয়া উঠিল। তৃতীয়

মহাযুদ্ধ সমাগত, ইহাতেও ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল দ্বিতীয় যুদ্ধ অপেক্ষাও এ যুদ্ধ প্রবলতর। ঈশ্বরের আদেশ অথবা প্রত্যাদেশভূমির উপরে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদল প্রত্যাদেশবাদী, অন্য দল প্রত্যাদেশবিরোধী, এই দুই দল যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। সেই পূর্ব্বোক্ত বিবেকী ব্রহ্মভক্তদল বলিলেন, "যাহা বিবেকের আদেশ তাহাই ঈশ্বরের বাণী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা। নিজের ইচ্ছা সংযত হইলেই ঈশ্বরের আদেশ এবং তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা যায়।" প্রত্যাদেশ বিরোধীদল ইহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন; "ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন তদনুসারে চলিলেই ধর্ম্মসাধন হয়, ঈশ্বর কখন প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের নিকটে তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন না, কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ শুনিতে পায় না।' দুই দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল. কামানের গোলা উঠিতে লাগিল ও পড়িতে লাগিল, যুদ্ধের ধূম স্তম্ভের আকৃতি ধারণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ঘটিয়াছিল, এই তৃতীয় যুদ্ধও সেই মঙ্গলময় বিধাতার অভিপ্রায়েই ঘটিয়াছিল, ইহাতে উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং বিশ্বাসীদিগের বিশেষ কল্যাণ কুশল হইয়াছে। এই তৃতীয় যুদ্ধ হইতেও জীবের কল্যাণদাতা ভগবান্ তাঁহার এক প্রবল সত্য উদ্ধার করিয়া নববিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৃতীয় যুদ্ধে এই শিক্ষা লাভ হইল যে বিবেকের বাণীকে ব্রহ্মবাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। তৃতীয় যুদ্ধ এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত যোগী সাধকদিগের নিকটে প্রত্যক্ষভাবে আদেশ দান করেন, এবং তাঁহাদিগের প্রাণের মধ্যে স্বয়ং প্রাণ ও শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করেন। ভক্তাধীন ভগবান্ তাঁহার ভক্তদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভক্তদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে কৃষ্ণ পাণ্ডবসখা নাম ধারণ করিয়া অর্জুনের সারথি হইয়া আপনি রথ চালাইয়াছিলেন। সেইরূপ ভগবান্ স্বয়ং প্রত্যাদেশবাদীদিগের বন্ধু হইয়া আপনি তাঁহার নববিধান রথ চালাইতে লাগিলেন। স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর ভক্তসখা সারথি হইয়া প্রত্যাদেশবাদীদিগকে জয়ী করিলেন। এই ভয়ানক কলিযুগের মধ্যেও

ঈশ্বর কথা কহিয়া ভক্তদিগকে রক্ষা করেন এই সত্য প্রমাণিত হইল। নিরাকার অদৃশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও প্রেম নয়নে দেখা যায়, অশব্দ ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী বিবেককর্ণে শুনা যায়, নিকটতম অন্তরতম ঈশ্বরকে স্পর্শ করা যায়, এবং তাঁহার সঙ্গে নিত্য প্রত্যাদেশযোগে যোগী হওয়া যায়, এ সকল গুরুতর সত্যতো স্বীকার ও সাধন করিতেই হইবে। যে কলিযুগে সহস্র সহস্র স্বেচ্ছচারী লোক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না, সেই কলি-যুগের মধ্যেই তাঁহার প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট সন্তানগণ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া পৃথিবীর পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে-ছেন, তৃতীয় যুদ্ধ উজ্জলতর রূপে এই সত্য প্রকাশ করিলেন। এই তিন যুদ্ধে তিন অমূল্য সত্য লব্ধ হইল। প্রথম যুদ্ধে এক ঈশ্বর অথবা সমস্ত জগতের এক পিতা,—এই সত্য নিষ্পন্ন এবং প্রকাশিত হইল, দ্বিতীয় যুদ্ধে সেই পিতার ইচ্ছাধীন বিবেকী সৎপুত্রের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইল, তৃতীয় যুদ্ধে সাধকদিগের আত্মাতে পবিত্রাত্মার সিংহাসন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল। এই তিন যুদ্ধের পরে মহাপ্রভু পরমেশ্বর তাঁহার সাধকদিগকে বলিলেন, "সচ্চিদানন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর।" সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন ভাবের সমষ্টি সচ্চিদানন্দ। তিনটি যুদ্ধের পর এই তিনটি সত্য, এই ত্রিভাব অথবা ত্রিনীতিমত প্রকাশিত হইয়া নববিধান সঙ্গঠিত হইল। মঙ্গলময় বিধাতা অতি আশ্চর্য্যরূপে এ সকল ঘটনা ঘটাইলেন। এই তিন যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার জয় হইল। প্রথম যুদ্ধে নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার পূজা অর্চনায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে সেই ব্রহ্ম-বাদীদিগের মধ্যে কএক জন বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা করিলে জীবন পবিত্র ও সুখী হয় না, প্রত্যহ বিবেকী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হইয়া জীবনের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রতি দিন সরল হৃদয়ে বলিতে হইবে,— "হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা নহে; কিন্তু আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" সেই জেরুসেলাম নগরে স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছাধীন ঈশা যেমন এই কথা বলিতেন, ভারতবর্ষের বিবেকী ব্রহ্মানুরাগিগণও এই

কথা বলিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের ইচ্ছাগত মিলন চাই, কেবল পিতার পূজা করিলে হইবে না, কিন্তু সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়া জীবনে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। ইচ্ছা যোগ দ্বারা পরমাত্মা পক্ষীর সঙ্গে স্বষ্টাত্মা পক্ষীর সখ্য যোগ করিতে হইবে। এইরূপে এক বিবেক-সূত্রে ঈশার প্রাণ বঙ্গবাসী ব্রাহ্মের প্রাণ হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধে এই পিতা পুত্রের মিলনতত্ত্ব প্রকাশিত হইল। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরপুত্র ঈশা ঈশ্বরের বাক্য অথবা জ্ঞানের নিঃসরণ। চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য অথবা সুবুদ্ধি। যে সুবুদ্ধি সৎ পুত্রের মধ্যে অবতীর্ণ অথবা যে ইচ্ছা ও শক্তি তনয়ের জীবনে সঞ্জীবিত তাহার জয় হইল। কিন্তু ইহাতেও ভাগবত পূর্ণ হইল না। এই জন্য তৃতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন হইল। সাধক বিবেকী হইয়াও ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে পারে। সাধককে ঈশ্বরের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য পবিত্রাত্মার আবির্ভাব প্রয়োজনীয়। যখন ঈশ্বরের বিবেকী পুত্রের অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রকাশ হয় তখন তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন, এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের বাণী অবলম্বন করেন। পবিত্রাত্মা কর্তৃক পরিচালিত না হইলে মানুষ ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী শুনিতে পায় না, এবং শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারে না। এই পবিত্রাত্মা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনে আনন্দ ও শান্তি সমাগত হয়। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে পবিত্রাত্মার অন্যতর একটি নাম আনন্দ দাতা। এই রূপে আমরা প্রাচীন আর্য্য মহাবাক্য সচ্চিদানন্দের মধ্যে খৃষ্টীয় ত্রিদেব মতের ঐক্য দেখিতেছি। প্রথমতঃ 'সৎ' অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাঁহার অন্য নাম উপাধি নাই, যাঁহার একমাত্র নাম "আমি আছি"। অতএব 'সৎ' সর্ব্বপালক ঈশ্বরের পিতৃভাববাচক, 'চিৎ' তাঁহার পুত্র-ভাববাচক এবং 'আনন্দ' তাঁহার পবিত্রাত্মাপ্রদ শান্তি ও আনন্দবাচক। সৎ, চিৎ, আনন্দ, অথবা জলন্ত ব্রহ্ম, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিনের মিলনে নববিধান প্রতিষ্ঠিত। তিন প্রকাণ্ড যুদ্ধের পরে, এই তিন মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিন সত্যের মিলনে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ গৌরব সমুজ্জ্বলিত হইল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা অথবা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া শুদ্ধ হও, এবং শান্তি ও কুশল লাভ কর।